কাঁদিয়া কহিল শৈলজা দুঃখিনী
অনাথিনী আমি ভূষণহীনা,
কি নিবে তোমরা, কি আছে আমার,
সধবার এই চিহ্নটী বিনা।
কহে অন্য জনে চাহি না গহনা
পরমা সুন্দরী রমণী এ যে,
ইহারে নিলেই হবে খুব লাভ
গহনা কি ছার ইহার কাছে?
হুঙ্কারে সকলে আসিল ছুটিয়ে
দৈববলে শক্তি লভিয়ে বালা
কহিল "ঈশ্বর আমার সহায়,
'অমর' নামটী জপের মালা"।
ঈষৎ হাসিয়ে কটী হতে অসি
লইয়ে বিঁধিল কোমল বুকে,
লুটায়ে পড়িল ধরণীর কোলে
বহুদিন পরে ঘুমাতে সুখে।
বিদ্যুতের মত আসি দলপতি
যতনে তাহারে লইল কোলে
ডাকিল যতনে "শৈল! একি?" শৈল
চাহিল সুধীরে নয়ন খুলে।
"শৈল! আমি দস্যু, নরাধম আমি,
তব স্বামী নাম অযোগ্য মোর,
তুমি দেবী, তুমি পবিত্রহৃদয়া
আমি স্বামী তব পিশাচ চোর"।
সেই ম্লান ঠোঁটে বহুদিন পরে
ক্ষীণ হাসি রেখা উদিল হায়!
"মরিব এখন তোমার চরণে
এ পরাণ আর কিছু না চায়"।
"শৈল! শৈল! আমি ঘৃণা অনাদরে
ফেলিয়ে এসেছি চরণে দলে,
কেন তুমি এই দস্যু নরাধমে
পূজিয়ে এসেছ দেবতা বলে।
অর্থলালসায় আমি এই কাজে
দেখিলাম হায় লাহিক সুখ,
শান্তিপূর্ণ সেই ছোট গৃহখানি
শৈলজা! তোমার মলিন মুখ
সতত আমারে দহিত নীরবে
কিন্তু আমি ঘৃণ্য পিশাচ সম,
দেবী সমা তুমি, তোমার নিকটে
যাইতে সাহস হয়নি মম।
কিন্তু আমি মোর পাপ প্রাণটুকু
তোমারি চিন্তায় দিয়েছি ফেলে
ভাবি নাই কভু পাইব তোমায়
এরূপ দশায় মৃত্যুর কোলে।"
আকাশে চাঁদিমা বরষিতেছিল
স্নিগ্ধ কররাশি অঞ্জলি পুরে,
তারকা বর্ষিছে কনক কুসুম
কুসুম ফুটিছে হরষ ভরে।
অন্য দস্যু সব চলি গেল দূরে
মৃত দেহটীকে লইয়ে কোলে,
'অমর' বসিয়ে নিঝুম নীশিথে
কাছে ডালিভরা বনের ফলে।

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন।

১৩।৪ নং মথুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 587. July, 1912.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৯ বর্ষ। ৫৮৭ সংখ্যা। | আষাঢ় ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।


## সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন—লর্ড লোরবার্ণ মন্ত্রিসভার চ্যান্সেলারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন এই পদ ত্যাগ করাতে সমরসচিব মিঃ হ্যালডেন তাঁহার স্থানে চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সমরসচিবের পদ কর্ণেল সিলি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মিঃ ষ্টেডের সম্পত্তি—এরূপ শুনা যাইতেছে যে, রিভিউ অব্ রিভিউ সম্পাদক মহাত্মা ষ্টেড এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

উষ্ণ প্রস্রবণ—রেভারেণ্ড এইচ, সির্প সিন্ধুদেশে করাচী হ্রদ ও পিপাঙ্গির নিকট তিনটী উষ্ণ প্রস্রবণ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল উষ্ণ প্রস্রবণের জলে অনেক প্রকার পীড়া আরোগ্য হয়।

ভারতে মহিলা চিকিৎসক—ডাক্তার এলিজাবেথ্ শ্লোন চেসার এম, বি, ডেলী ক্রনিকেল নামক পত্রে ভারতবর্ষে হাজার হাজার মহিলা ডাক্তারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনেক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে পুরুষদিগের চিকিৎসার সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের তাহাতে বিশেষ সুবিধা নাই, এজন্য অতি অল্প স্ত্রীলোকই তথায় যায়। স্ত্রীলোকদিগের জন্য সতন্ত্র যে সকল চিকিৎসালয় আছে, তাহাতেও অধিকাংশ পুরুষ চিকিৎসক কার্য্য করিয়া থাকেন, এজন্য অনেক ভদ্র মহিলারা তথায় যাইতে পারেন না। ইহাঁদের চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তার নিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

বৎসরে আড়াই লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়া মহিলা ডাক্তার নিয়োগ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।

মিষ্টার তিলকের পত্নীবিয়োগ—গত ৬ই জুন পুনা নগরে মিঃ বালগঙ্গাধর তিলকের পত্নী সত্যভামা বাই ৫০ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ পতি, তিনটী কন্যা ও দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

নূতন খাম—বিলাত হইতে এক প্রকার নূতন রেজিষ্টারীর খাম আনীত হইয়াছে, ইহার মূল্য দশ পয়সা। ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের মুখাঙ্কিত দুই পয়সা দামের ছোট খামও আনীত হইয়াছে। ১লা জুলাই হইতে ভারতের পোষ্ট আফিসসমূহে ইহা বিক্রয় হইতে থাকিবে।

নূতন দিল্লী—দিল্লীর যে স্থানে দরবার হইয়াছিল সেই স্থানে নূতন দিল্লী নির্ম্মিত হইবে না; বর্ত্তমান দিল্লীর দক্ষিণে শৈলমালা ও কুতব রোডের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উহা নির্ম্মিত হইবে।

র‍্যাংলার পরীক্ষা—এবার ইংলণ্ডের র‍্যাংলার পরীক্ষায় ভারতবর্ষের দুইটী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মান্দ্রাজের মিঃ রামমূর্ত্তি ও ঢাকার মিঃ ভূপতিমোহন সেন র‍্যাংলার পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন।

---

# প্রায়শ্চিত্ত।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এক বৎসর হইল মোহিত ও নীরজার একটী কন্যা হইয়াছে। কন্যাটীর নাম লীলা। ক্ষুদ্র লীলাকে লইয়া স্বামী স্ত্রীতে অনেক সময় মহা তর্ক বাধিয়া যাইত। নীরজা বলিত "লীলা দেখিতে তোমার মত হইয়াছে", মোহিত বলিত "আহা তোমার কি সৌন্দর্য্যজ্ঞান! লীলা ঠিক্ তোমার মত হবে।" ক্রমশঃ বিবাদ ঘনীভূত দেখিয়া ক্ষুদ্র লীলা বড় মুস্কিলে পড়িত। সে তখন পিতামাতার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উভয়ের মুখ দুই হাতে ধরিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিত। তখন তাহার উপর দুই দিক হইতে চুম্বন বৃষ্টির হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত।

মোহিত অপরাহ্নে আদালত হইতে আসিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিল। নীরজা নিকটে দাঁড়াইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। মোহিত বলিল "লীলা কই?"

"তাকে ঝি বেড়াতে নিয়ে গেছে"।

মোহিত একটু হাসিয়া বলিল "আমার পকেটে একখানা কাগজ আছে, আন তো, তোমাকে একটা খবর শোনাই।" "আচ্ছা খবর শোনা শেষে হবে, এখন

তো আগে জল খেতে চল"। "জল খাইবার আজ তত ইচ্ছা নাই, কাগজ খানা আন না"।

নীরজা শুনিল না, খাবারের রেকাবী হাতে করিয়া আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিল "নূতন খবর দেখ্‌লে বুঝি ক্ষুধা তৃষ্ণাও উড়ে যায়? একটু খাও, আমি তো আর পালাচ্ছিনা, কাগজখানাও পালাবে না"। মোহিত হাসিতে হাসিতে বলিল "কি জানি, আমার সব সময়ে সে বিশ্বাসটা থাকে না. কাগজখানা যেমন রাস্তা দিয়ে আসিতে আসিতে অক্লেশে পকেট থেকে পড়ে যেতে পারে, তোমার বিষয়েও আমার তেমনি একটু ভয় আছে। তবে জলখাবারটা যখন হাতের কাছেই এনে ধরেছ, তখন আর ভেবে চিন্তে কাজ নাই, কি বল"? নীরজা হাসিয়া বলিল "সেই ভাল কথা"।

মোহিত জলযোগ শেষ করিয়া মুখে পান পুরিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। নীরজা তাহার পকেট হইতে একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল "এই-বার কি সংবাদ বল? এখন নিশ্চিন্ত হয়ে শোনা যাবে;" মোহিত হাসিয়া বলিল "তুমিই পড় না"।

"অত্র কাজ নাই, আমি পড়িতে জানি না, শুনাতে ইচ্ছে হয় তো শুনাও" বলিয়া নীরজা একটা পেনি লইয়া সেলাই করিতে বসিল। মোহিত পড়িল— "হরিশপুরের জমিদার নবকিশোর বাবু সম্প্রতি বিগ্রহের মন্দির স্থাপন উপলক্ষে অজস্র দান করিয়াছেন। শত শত কাঙালীকে অর্থ, অন্ন, বস্ত্রাদি দান করিয়াছেন। তিনি কতকটা জমিদারী দেবত্র করিয়া দিয়াছেন, একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, দুই তিনটা জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এইরূপ সৎকর্ম্ম সর্ব্বদাই করিতেছেন। নবকিশোর বাবু হিন্দুর আদর্শস্থল।"

নিরজা নীরবে বসিয়া রহিল। মোহিত বলিল "নিরো কথা কচ্চ না যে"? নিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরজা বলিল "তবে বোধ হয় দাদাকে কিছুই দেবেন না, তাকেও ত্যাগ করবেন"। "সে তো কবে বোঝা গেছে। তোমার বাবা মৃত্যুর পূর্ব্বে 'আমার অপরাধ মাপ করুন' বলে দুখানা পত্র লিখ্‌লে তার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন 'তুই, তোর পুত্র, কন্যা, সব আমার ত্যাজ্য'। তখনই বুঝা গিয়াছিল এ রাগ তাঁর যাবে না।" নীরজা অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমিই সবারি মনকষ্টের মূল"। "আর একটা খবর আছে, দেখ"।

নীরজা সংবাদপত্র লইয়া দেখিল "প্রসিদ্ধ জমিদার নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত বিষয় কনিষ্ঠ পুত্র সতীশকুমারকে উইল করিয়া দিয়া কাশীবাস করিতে গেলেন"।

মোহিত নীরজাকে বহুক্ষণ নতমুখে থাকিতে দেখিয়া বলিল "নিরো"। নীরজা উত্তর দিল না। মোহিত নিকটে

আসিয়া তাহার মুখ তুলিয়া দেখিল নীরজা কাঁদিতেছে। মোহিত আদর করিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, "কাঁদো কেন নিরো, ইহাতে এমন দুঃখ কি ?" "আমার জন্য তুমি এত সইলে।" নীরজা তাহার বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইল। মোহিত তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিল "তুমিও তো অনেক সয়েছ। তোমার দাদা বাবুও তো তোমার উপর রাগ করেছেন। আমি তোমার জন্য সয়েছি, তুমি আমার জন্য সয়েছ, এ কথাটা আর এখন নূতন কথা কি নিরো ?"

তবুও নীরজা কিয়ৎক্ষণ কাঁদিল। মোহিত তাহার জন্য কেন এত সহিল ভাবিয়া কাঁদিল। তাহার জন্য কেহ এত সহ্য করিতে পারে এমন গুণ তাহাতে কি আছে ভাবিয়া কাঁদিল। তার পর লীলা বেড়াইয়া আসিল। লীলার সহিত মোহিতের ক্রীড়া দেখিয়া নীরজা ক্রমে ক্রমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর আরও তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। লীলা এখন আর দাসীর অঙ্কে বেড়ায় না। সে এখন চারি বৎসরের হইয়াছে। বৈকালে সিল্কের গাউন ও জুতা মোজা পরিয়া কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলি স্কন্ধে ফেলিয়া পিতার হাত ধরিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। সে মাতার কাছে সন্ধ্যার আলোকে প্রথম ভাগ লইয়া "অ'য় অজগর আস্‌ছে তেড়ে" ইত্যাদি বলে। পিতার মাথা আঁচড়াইয়া দেয়, খাবার আনিয়া সম্মুখে ধরার ভারটাও মাতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। মোহিত হাসিয়া বলিত "লীলা আর একটু বড় হলে দেখ্‌ছি, ও আমাকে এ ঘর, ও ঘর কর্‌তে দেবে না।" লীলা মৃদু হাসিয়া বলিত "আমি তো তোমার কলে কল্‌তে পালিনে বাবা"। মোহিত অত্যন্ত হাসিয়া উঠিত। মোহিতের এখন পূর্ব্বাপেক্ষা পসার বৃদ্ধি হইয়াছে, তবে দানশীলতার জন্য হাতে কিছু জমাতে পারিত না।

পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার পর মোহিত ও নীরজা ছাতে বসিয়া অতীত কালের কথা আলোচনা করিতেছিল। মোহিত তাহার সেই স্কুলে যাওয়ার কথা, দানের কথা, নিজের দাঁড়াইয়া দেখার কথা গল্প করিতেছিল। নীরজা শুনিয়া হাসিতেছিল, আর সেই সময়ের সুখময় জীবনের কথা ভাবিতেছিল। সেই স্নেহময় পিতা মাতার কথা মনে পড়িয়া মাঝে মাঝে চক্ষুতে জল আসিয়া পড়িতেছিল। চারি দিক চন্দ্রকিরণে হাসিতেছিল।

এমন সময়ে দাসী আসিয়া একখানা পত্র আনিয়া মোহিতের হাতে দিল। মোহিত খুলিয়া দেখিল লণ্ডন হইতে সুরেন্দ্র লিখিয়াছে। এক বৎসর হইল সুরেন্দ্র সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে। মোহিত পত্র পড়িয়া হাসিয়া বলিল "নিরো সুসংবাদ।" "কি সুসংবাদ ?" "আগে সন্দেশ খাওয়াও, তবে বলব।" "এমন কি কথা ?" "নয় কেন ? তোমার

ভাজ হয়েছে, সুসংবাদ নয়?" "সে কি? দাদা মেম বিয়ে করেছে বুঝি"? "তা নাত আর বিলাতে হিন্দুর মেয়ে পাবে কোথায়"? "ছিঃ ছিঃ, শেষে মেম বিয়ে কর্‌লে"। "যেমন দেশে বাস তেমনি তো রুচি হবে। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। আজ যদি তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন তো এ বিবাহ হ'তে পারতো না।" সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথা মনে পড়িয়া গেল, মোহিত অধোবদন হইল, নীরজা অত লক্ষ্য করিল না। নীরজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "দাদার ছোট বেলা থেকে অমনি সাহেবী পছন্দ, মা থাক্‌লে তো বিলাতী বৌ নিয়ে একদিনও ঘরকন্না করতে পারতেন না"। নিজেকে সাম্‌লাইয়া মোহিত বলিল "এখন যা হবার হ'য়ে গেছে, আনন্দ প্রকাশ করে একটা টেলি-গ্রাম করিগে চল। আর ছাতে বসে থাক্‌ব না, আজ শরীরটা ভাল নাই। এখন কেমন একটু শীতও কর্‌ছে"। নীরজা উঠিয়া বলিল "তবে এতক্ষণ ছাতে বসে থাক্‌লে কেন, শীঘ্র নীচে চল"।

রাত্রিতে মোহিত বলিল "নীরো গায়ের একটা কাপড় দাও, বড় শীত কচ্ছে"। নীরজা মোহিতের কপালে হাত দিয়া বলিল "একি, গা যে গরম"। "তবে বুঝি জর হ'ল" বলিয়া মোহিত আপাদমস্তক ঢাকিয়া শয়ন করিল। অর্দ্ধ রাত্রে নীরজা ধীরে ধীরে মোহিতের ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল কপালটা একটু বেশী গরম হইয়াছে। মোহিত তখন ঘুমাইতেছে, নীরজার মনটা আজ কেমন করিতেছিল, মোহিতের পুর্ব্বে এরূপ জর কতবার হইয়াছে, কিন্তু কোন দিন ত এমন মন-খারাপ হয় নাই। নীরজা মনকে বুঝাইল "এমন জর ত কত দিন হয়"। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নীরজা ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে মোহিত সুরেন্দ্রের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইয়া বলিল "জরটা বেশই হয়েছে"। নীরজা থার্ম্মোমিটার লাগাইয়া দেখিল জরের উত্তাপ একশ দুই ডিগ্রী হইয়াছে। নীরজার সমস্ত দিন কাজে হাত পা উঠিতেছিল না। লীলা পিতার কপালে ক্ষুদ্র হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে বলিল "বাবা তোমার অসুখ করেছে?"

মোহিত বলিল "হাঁ মা, তুমি একটু আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, ভাল হয়ে যাবে"। বৈকালে নীরজা বলিল "এখনও জর তেমনি আছে, ডাক্তার আনতে পাঠাও"। "আজ থাক্, কাল ডাক্‌ব, অসুখ হতে হতেই ঔষধ খেলে কোন ফল হয় না।"

(ক্রমশঃ)

---

# শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

আজকাল অন্যান্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকেরা যে সংসারে নিজেদের অধিকার বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতেছেন—ইহা সভ্য জগতের একটি সুলক্ষণ। কুসংস্কার ও গোঁড়ামি সকল সমাজেই দেখা যায়, বিশেষত উহার প্রভাবে আমাদের নারীগণের সীমাবদ্ধ জীবন অধিকতর অপ্রশস্ত হইয়া উঠে। সেই কারণে তাঁহারা ঐ অত্যাচার দূর করিবার জন্য যত বেশী ব্যগ্র হন ও আপনাদিগকে সমাজের প্রয়োজনীয় কার্য্যের উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত যত অধিক উৎসুক হন, ততই সংসারের পক্ষে মঙ্গল।

যে সকল লোক স্ত্রীলোকদিগকে সংসারের ন্যায্য অধিকার দিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা উহার স্বপক্ষে এরূপ যুক্তি দেখান যে, তাহা অবিবেচক ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের প্রথম আপত্তি এই যে—"যদি সকল সাধারণ কাজে নারীজাতিকে যোগ দিবার অধিকার দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা গৃহকর্ম্মে ও সন্তানপালনে অবহেলা করিবে।" কিন্তু স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক জ্ঞান এত প্রখর যে, তাহা উহা দ্বারা বিনাশ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতি স্ত্রীজাতিকে যে জীবনের উপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই জীবনেরই প্রসার ও উন্নত অবস্থা লাভের নিমিত্ত উৎসুক। ঐ প্রকার স্বাধীনতা কখন তাঁহাদের সংসারপ্রেমের অপকার করিতে পারে না, কিম্বা জননীর পবিত্র কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা জন্মাইতে পারে না। সেই কারণে, সংসারে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগেরও জ্ঞানচর্চ্চা, বুদ্ধিবিকাশ ও চরিত্রগঠন করা আমাদের এখন প্রধান কাজ। আশা করি, বর্ত্তমান কালের জ্ঞানতৃষ্ণা ও উন্নতি লাভের বাসনা আমাদের ঐ মহৎ কার্য্যের সহায় স্বরূপ হইবে।

এইরূপে স্ত্রীজাতি হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা এখন আমাদের প্রকৃত প্রস্তাবে আসিলাম। এই বিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বত্রই প্রশস্ত জ্ঞানচর্চ্চা ও বিদ্যার গৌরব দেখা যাইতেছে, এবং ঐ আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির জন্য অন্যান্য স্থানের ন্যায় আমাদের দেশেও সকল বিভাগে নানা স্কুল, কলেজ ও শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে। যুবকেরা উহা দ্বারা নিজেদের উন্নতি সাধন করিয়া উচ্চ পদ ও উচ্চ অধিকার প্রাপ্তির আশায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

কিন্তু ঐ যুবকদিগের শিক্ষকগণ যে ভূমিতে জ্ঞানাঙ্কুর রোপণ করিবার জন্য ব্যস্ত, সে ভূমি কি পিতামাতার দ্বারা সযত্নে কর্ষিত ও শিক্ষার বীজ বপনের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে ?

এ প্রশ্নের উত্তর অনেকের নিকট অপ্রিয় বোধ হইলেও বালকদিগের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আশায় আমরা তাহা করিতে বাধ্য হইলাম। যে শিক্ষা বালকবালিকা-দিগের জীবনের প্রারম্ভেই শেষ হয়, যে অসম্পূর্ণ বিদ্যা তাহাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানের পথ পর্য্যন্তও দেখাইতে পারে না এবং যাহা তাহাদিগকে প্রাপ্ত বয়সের উপযুক্ত বুদ্ধি ও বিবেক দিতে অপারগ, সে শিক্ষা নিশ্চয়ই যুবকদিগের পক্ষে অনুপযুক্ত ও সংসারের ক্ষতিকারক। ঐরূপ অপকারী বিদ্যা শিক্ষাই আমাদের সমাজের শোচনীয় অবস্থা ও বিপদের প্রধান কারণ। নীতি-জ্ঞানশূন্য দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিগণই অর্দ্ধশিক্ষিত যুবকদিগের মস্তক বিগড়াইয়া দিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, জ্ঞানী ও সাধু লোক-দিগের উপদেশ পাথরে জলসেচনের ন্যায় ঐ অপক্ক মস্তিষ্কে লাগিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে। অধিকাংশ দেশেরই যত প্রকার সামাজিক ভ্রম এই অর্দ্ধশিক্ষা হইতে জন্মিয়া থাকে। বুদ্ধিমান্‌, অভিজ্ঞ, মহৎ ব্যক্তিদিগের হিতকর বাক্য ও উপদেশ যথার্থ বুঝিয়া কাজ করিলে কোন জাতিই শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অকৃতকার্য্য হয় না। কিন্তু অযোগ্য লোকেরা ঐ সকল উন্নত বাক্য ও ভাব লইয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে উহা অর্দ্ধশিক্ষিত লোকদিগকে এরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় উপনীত করে যে, অনেক কষ্ট ব্যতিরেকে তাহা-দিগকে তাহা হইতে উদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই কারণে শিশুদিগের জন্ম হইতে তাহাদিগের মন প্রাণ উন্নত করিবার চেষ্টা করার ন্যায় উৎকৃষ্ট শিশুশিক্ষার উপায় আর কিছুই নাই। সুতরাং ঐ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সংসারে স্ত্রীলোকের কাজ যে কত মহৎ ও কঠিন, আর মানবজাতির সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে সকল বিষয়ে যে কতদূর জ্ঞানশালিনী ও শিক্ষিতা করা উচিত, তাহা বলা যায় না। ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন যে, নারীজাতির অবস্থা আরও উন্নত ও তাহাদের জীবন আরও অধিক প্রশস্ত হইলে তাহারা জননীর কর্ত্তব্যে বিমুখ হওয়ার পরিবর্ত্তে অধিকতর যত্ন ও আগ্রহের সহিত উহাতে প্রবেশ করিবে?

অতি শিশুকাল হইতে সন্তানদিগকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে মানুষ করার পক্ষে সাধারণ লোকের বড় আপত্তি দেখা যায়—আপত্তি কেন, এ কথার উল্লেখ করিলে প্রাচীন মাতা ও দিদিমারা আমাকে বাতুল বলিয়া স্থির করিবেন। তাঁহাদের মতে বালিকা মাতারা যতই কেন অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ হউক না—সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা শিশুপালনের উপযুক্ত জ্ঞান ও শিক্ষা আপনা হইতেই লাভ করিয়া থাকে। জননীর অসীম প্রেম ও স্বাভাবিক জ্ঞানের উপর তাঁহাদের একান্ত নির্ভর, শিশুকে প্রকৃতরূপে শিক্ষা দিয়া লালন করিতে হইলে ঐ অপরিসীম স্নেহ ও যত্নের উপর আরও যে কোন শিক্ষার

আবশ্যক তা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন না। সুতরাং সাধারণ লোকের ঐ কুসংস্কার মানবসমাজের, বিশেষতঃ আমাদের দেশের উন্নতিলাভের পক্ষে মহা প্রতিবন্ধক।

### শিক্ষার আরম্ভ।

অনেকে জানেন, উপযুক্ত শারীরিক যত্নের অভাবে কত হাজার হাজার শিশু এক বৎসরের পূর্ব্বেই মারা যায়। কিন্তু যাহারা ঐ অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়, তাহারা নীতিজ্ঞান শিক্ষার অভাবে পর জীবনে কিরূপ চিররুগ্ন থাকে, তাহার দিকে আমরা একটুও দৃষ্টি রাখি না। মানবসমাজে যে সকল অপকারী ও বিপদজনক রীতি নীতি দেখা যায়, তাহা কেবল অশিক্ষিত বা অশাসিত বাল্যাবস্থা হইতেই জন্মে।

সেজন্য আমরা সকল দিক পর্য্যালোচনা ও পরীক্ষা করিয়া আগে দেখিব, পরে বিচার করিব। সদ্যোজাত মানবশিশুর ন্যায় এ সংসারে অসহায় ও দয়ার পাত্র আর কি আছে? অন্য কোন জন্তুকে জন্মকালে ওরূপ অসহায় বোধ হয় না বা যত্নাভাবে উহা বিনাশ পায় না। তথাচ ঐ দুর্ব্বল শিশুজীবন কি মিষ্ট ও হৃদয়াকর্ষক। ঐ সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে হৃদয় স্নেহে ভরিয়া উঠে! কত যত্নে উহা বুকে তুলিয়া লইবার জন্য প্রাণ ব্যগ্র হয়! কিন্তু ঐ কোমল জীবকে বাঁচাইয়া মানুষের উপযুক্ত করিতে মাতৃস্নেহের সঙ্গে আরও কত জ্ঞানের আবশ্যক। জীবনের প্রথম বৎসরে শিশু তিন গুণ বাড়ে, আর ষোল বৎসরে এরূপ বাড় বাড়ে না। কিন্তু শারীরিক স্বাস্থ্যবিধানের অজ্ঞতা ও পিতামাতার অনবধানতা বশতঃ ঐ প্রথম বৎসরেই অধিকাংশ শিশু বিনাশ পায়।

মাতার প্রেম শিশুর জীবনধারণে বাতাসের ন্যায়, উহা ব্যতীত শিশু এক দণ্ড বাঁচিতে পারে না। সুখের বিষয়, এ জগতে মাতৃস্নেহের কোন অপ্রতুল নাই। কিন্তু শিশুর প্রাণধারণের জন্য নিঃশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে যেমন আরও অন্যান্য দ্রব্যের আবশ্যক, সেইরূপ উহার সম্পূর্ণ সুখসচ্ছন্দতার জন্য প্রেমের সঙ্গে আরও অন্যান্য শিক্ষার প্রয়োজন। ঐ ক্ষুদ্র দেহটার যত্ন শুধু স্নেহ দ্বারা হইলে চলিবে না, বুদ্ধির দ্বারাও হওয়া উচিত। বালিকা মাতার স্বাভাবিক বুদ্ধির অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী ও বিবেচক ব্যক্তিদিগের উপদেশমতে। উহাদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক পুষ্টি সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, আমাদের দেশের বালিকাদিগের প্রথম সন্তান মাতামহী বা পিতামহীদিগের দ্বারাই প্রায় প্রতিপালিত হইয়া থাকে। মাতার সন্তানপালনে অক্ষমতা বশতঃই যে এই প্রথার প্রাচুর্য্য দেখা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? ডাক্তারেরা সচরাচর বলেন যে, শিশুকালের ন্যায় মানবজীবনে আর কোন কালে অত সংঘাতিক পীড়া হয় না, বা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না। শিশুদিগের দেহ স্বভাবতঃ অতি কোমল এবং সাধারণ

লোকে কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে, অযোগ্য খাদ্য ও অবিশুদ্ধ বাতাস কচি ছেলের জীবনে সর্ব্বদা বিষের কাজ করে। শিশুজীবনের প্রথম বৎসর কাটিয়া যাইলে জীবননাশের সম্ভাবনা কিছু কমিয়া আসে, কিন্তু পাঁচ বৎসরের পুর্ব্বে সন্তানদিগকে কখন একেবারে নিরাপদ মনে করা যাইতে পারে না।

এখন শিশুদিগের এই প্রথম পাঁচ বৎসর কাল তাহাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা ও পুষ্টি সাধনের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা আমাদের উচিত। জীবনের আর কোন কালে তাহারা এত অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না।

( ক্রমশঃ )

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

---

## জলপ্লাবন।

সকল দেশেরই পুরাবৃত্তে জলপ্লাবনের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাইবেলে উল্লিখিত বিবরণ অনুসারে ঐ জলপ্লাবন সৃষ্টির ২৩২৯ বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল। পৃথিবী পাপাত্মায় পরিপূর্ণ হওয়াতে পরমেশ্বর ধার্ম্মিকবর নোয়াকে নিজের ও পরিবারবর্গের রক্ষার্থ একখানি তরণী নির্ম্মাণ করিবার আদেশ করেন, সেই তরণীর আয়তন ৩০০ হস্ত দীর্ঘ, ৫০ হস্ত প্রস্থ ও ৩০ হস্ত গভীর। তরণীখানি নির্ম্মিত হইলে, ঈশ্বর পুণ্যাত্মা নোয়াকে তন্মধ্যে সকল প্রাণীর স্ত্রী পুরুষ এবং তাহাদিগের আহারীয় দ্রব্য গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তৎপরে যে জলপ্লাবন হয়, তাহাতে চল্লিশ দিন এবং চল্লিশ রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, যতদিন না সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশ জলে প্লাবিত হইয়াছিল ততদিন বর্ষণের অবসান হয় নাই। সুযোগ্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, হিমালয়ের উচ্চতম শৃঙ্গে যে সকল জলজন্তুর কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এরূপ একটী জলপ্লাবন না হইলে তাহা সম্ভব হইত না।

অদ্য আমি যে জলপ্লাবনের বৃত্তান্ত পাঠিকাদিগকে উপহার দিব, তাহা বেদের শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত। যে সকল পাঠিকা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মহাভারতের বনপর্ব্বের ১৮৭ অধ্যায়ে ঐ জলপ্লাবনের বিবরণ দেখিতে পাইবেন। আমরা সংক্ষেপে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বৈবস্বত মনুর সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকা প্রচারিত হইয়াছিল।

একদা বৈবস্বত মনু চিরিণী নদীর তীরে অর্দ্ধ বৎসর তপস্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটী মৎস্য আসিয়া তাঁহাকে বলিল "মহর্ষে বিধাতার নিয়ম অনুসারে প্রবল প্রাণিগণ দুর্ব্বলদিগকে বিনাশ করে। আমি দুর্ব্বল মৎস্য, আপনি

আমাকে এইরূপ বিনাশ হইতে রক্ষা করুন, সুযোগ উপস্থিত হইলে আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব”। মুনি এই বাক্য শুনিয়া মৎস্যটীকে আপনার হস্তে লইয়া গৃহে আগমন করিলেন। তিনি তাহাকে অঞ্জলি-পরিমিত জল-পূর্ণ এক পাত্রে রক্ষা করিলেন। মৎস্য মনুর স্নেহে ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার শরীর ক্রমে এরূপ দীর্ঘ হইল যে, সেই ক্ষুদ্র পাত্রে আর তাহা সঞ্চালন করিবার স্থান হইল না। তখন মৎস্য আবার মনুকে বলিল “প্রভো! আমাকে অন্য এক বৃহৎ পাত্রে স্থাপন করুন”। বৈবস্বত মনু তদনুসারে তাহাকে দুই যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন প্রস্থ এক বাপীতে রক্ষা করিলেন। ক্রমে সেখানেও মৎস্যের স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালনের স্থানাভাব বোধ হইতে লাগিল এবং মৎস্য মনুকে আবার বলিল “মহর্ষে আমাকে সমুদ্রের প্রিয়মহিষী গঙ্গাতে রক্ষা করুন।” মনু তাহাই করিলেন, কিন্তু গঙ্গাতেও স্বীয় শরীর সঞ্চালনের সুবিধা না হওয়ায় মৎস্য মনুকে বলিল “মহর্ষে আপনি আমাকে এখন সমুদ্রে নিক্ষেপ করুন। এখন ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইতেছে, আপনি একখানি সুদৃঢ় পোত নির্ম্মাণ করুন এবং সপ্তর্ষিদিগের সহিত তাহাতে আরোহণ করুন। এখন সকল স্থানের সমুদায় জীব ধ্বংস হইবে। পৃথিবী জল-মগ্ন হইলে কেবল সপ্তর্ষিগণ এবং আপনি জীবিত থাকিবেন। আমি শৃঙ্গ ধারণ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইব, আমার শৃঙ্গে আপনি ঐ নৌকা আবদ্ধ করিবেন”। অতঃপর বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং সকল দিক্ জলমগ্ন হইল। মুনি সেই সময় মৎস্যকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং মৎস্যও মুনির আন্তরিক ভাব জানিতে পারিয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইল। বৈবস্বত মুনি মৎস্যের শৃঙ্গে স্বীয় তরণী আবদ্ধ করিলেন এবং জলরাশির বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে উপনীত হইয়া তথায় স্বীয় পোত বন্ধন করিলেন। হিমাচলের ঐ স্থান এখনও নৌবন্ধন বলিয়া সাধারণ্যে বিদিত আছে।

মৎস্য এক্ষণে আপনার প্রকৃত স্বরূপ মুনির নিকট ব্যক্ত করিল। সে বলিল “আমি প্রজাপতি ব্রহ্মা, মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগকে এই ভয় হইতে পরিত্রাণ করিলাম”। পরে মনু পুনর্ব্বার প্রজা সৃষ্টি করিলেন।

বাইবেল গ্রন্থেও এইরূপ বর্ণিত আছে যে, নোয়া তাঁহার স্ত্রী, তিন পুত্র ও পুত্রবধূ এবং সর্ব্ববিধ জীবজন্তু লইয়া তরণীযোগে আরারাট ( Ararat ) নামক তৎকালীন সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গে উপনীত হন। পরে তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রজাসৃষ্টি হয়।

এরারাট্ পর্ব্বতের উচ্চতা ২০০০ ফুট ও হিমালয়ের ধবলগিরির উচ্চতা ছাব্বিশ হাজার আট শত ফুট।

# স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত।

খৃঃ ১৮৮৯ সালে উমেশ বাবুর সদ্ব্যবহারে মোহিত হইয়া আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া শেষ করিয়া, সিটি কলেজ হইতে উপাধি পরীক্ষা দি।

১৮৮৫ সালে এন্‌ট্রান্স পাস করিয়া আমি কলিকাতায় পড়িতে আসি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাত্রসমাজে যোগ দেওয়াতে উমেশ বাবু, শিবনাথ বাবু, বিজয় বাবু, নগেন্দ্র বাবু, ও রামকুমার বাবু প্রভৃতি কয়টী সজ্জনের সহিত আমার যোগ হয়।

উমেশ বাবু সিটি কলেজের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার শারীরিক রূপ বা অধ্যাপনার গুণে যে লোকে মোহিত হইত তাহা নহে। আমি কখনও তাঁহার নিকট পড়ি নাই। আমি বি, এল পাঠ প্রেসিডেন্সিতে সাঙ্গ করিয়া, ফি দাখিল করি উমেশ বাবুর কলেজে।

অন্যান্য ছাত্রদিগের মুখে শুনিতাম উমেশ বাবুর পড়ান অতি সাধারণ রকমের, অথচ মন্দ নহে।

তাঁহার মহত্ব দেহের বল বা সৌন্দর্য্যে ছিল না। তাঁহার গৌরব বিদ্যা বুদ্ধির বলে নহে।

উমেশ বাবু একজন অকপট, সাধু, পরোপকারী, নিষ্ঠাবান্ গৃহী ও কর্ম্ম-যোগী, ভক্ত ও সাধক ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাকে বলিতেন যে, ব্রাহ্ম সমাজে উমেশচন্দ্রই সকলের চেয়ে ভাল লোক। মহর্ষির এ কথাটী বুঝিতে আমার অনেক দিন লাগিয়াছিল। মহর্ষির উমেশ বাবুর সম্বন্ধে মত যৌবনকালে বুঝিতে পারি নাই, কেবল মানিয়া লইয়াছিলাম।

যৌবন অপগত হইলে, জীবনের সংগ্রামে পড়িয়া, বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়া দেখিলাম যে, গ্রীষ্মকালে তপনতাপে তাপিত পথিক যেমন সতৃষ্ণনয়নে কূপের দিকে, বটচ্ছায়ার দিকে, ও নিজের সঙ্গীর দিকে দৃষ্টিপাত করে,—আমিও তেমনি সংসার-মরুর মাঝে ভ্রমণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া, মাঝে মাঝে উমেশ বাবুর সুমধুর ও স্নিগ্ধ সহবাসের জন্য লালায়িত হইতাম।

আমার সঙ্গে তাঁহার বয়ঃক্রমের অন্ততঃ ২০ বৎসর প্রভেদ। আমার মতের সঙ্গে তাঁহার সকল মতের মিল ছিল না। অথচ দেখার পরদিন হইতেই তাঁহার সহিত অকপট বন্ধুতা জন্মিয়াছিল। তাহার মূলে কোন প্রকার স্বার্থ ছিল না।

১৮৮৯ সালে আমি "প্রেম" নামক গ্রন্থ রচনা করি। আমার সহধর্ম্মিণীও উমেশ বাবুর অনুরোধে বামাবোধিনীতে লিখিতে আরম্ভ করেন। উমেশ বাবু

বলিতেন যে, আমা অপেক্ষা তিনি ভাল রচনা করিতেন। আমারও ঐ মত। রচনা ও ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে তিনি আমার উত্তরসাধক। কিন্তু সন্তান হওয়ার পর হইতেই তিনি মানসিক সন্তানগণের প্রতি উদাসীনা হইলেন। উমেশ বাবু তাঁহাকে ২৪ পরগণা ইউনিয়নের পরীক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সর্ব্বপ্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। উমেশ বাবুকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও করেন। উমেশ বাবু সংসারের কার্য্যকে ধর্ম্মসাধনরূপে সম্পাদন করিতেন। সংসার তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মের অন্তরায় ছিল না। সংসারই তাঁহার ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র ছিল। সংসারই তাঁহার ধর্ম্মসাধনের উপায় ছিল। তিনি কলেজের চাকুরী যেমন নিষ্ঠার সহিত করিতেন, বামাবোধিনী মূক ও বধির বিদ্যালয়, সঙ্গৎ-সভা প্রভৃতি নানা জনহিতকর কার্য্য তেমনি ঘড়ির কাঁটার মত ঠিক সময়ে ও ঠিক নিয়মে সম্পন্ন করিতেন। এত কার্য্য তিনি কি প্রকারে করিতেন, আমরা ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতাম না। তিনি অসাধারণশক্তিসম্পন্ন লোক না হইলেও, সাধারণ অনেকগুলি কাজ যথানিয়মে বহুকাল ধরিয়া নিষ্পন্ন করা তাঁহার অসাধারণ শৃঙ্খলা ও কার্য্যপ্রণালীর, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার, নিষ্ঠা ও প্রেমের পরিচায়ক। অধিকাংশ কর্ম্মই তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে করিতেন।

এমন ধীর, বুদ্ধিমান্, সহিষ্ণু, সাবধান, বিনয়ী, নম্র, আড়ম্বরশূন্য ব্যক্তি সহসা নয়নগোচর হয় না।

উমেশ বাবুকে দেখিলেই বুঝা যাইত যে, সংস্কৃত ভাষায় কেন যোগীকে "ধীর" বলিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব উপদেশ করিয়াছেন,—

"তৃণাদপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন, কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

হরিনাম লইবার অধিকারী হইতে হইলে যে সব গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা উমেশ বাবুর ছিল। যে কোন সমাজে এ প্রকার লোক থাকেন, সেই সমাজই ধন্য হয়।

উমেশ বাবু হিন্দুসমাজে জন্মিয়া, হিন্দুভাব ও সাধনার মধ্য দিয়া আদর্শ গৃহী, কর্ম্মী ও সাধকরূপে ব্রাহ্মসমাজকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে সাধকের বড়ই অভাব,—কথকের অভাব নাই। উমেশ বাবু নীরব কর্ম্মবীর ছিলেন, বাচাল ছিলেন না,—ধর্ম্মোপদেশ দিতে হইলেও কথকতার প্রকৃতি ও প্রতিভা তাঁহার ছিল না।

উমেশ বাবু বাক্যে ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন না,—প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, তাই তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিতেন না, সকলকেই ভাল বাসিতেন। গদ্যে, পদ্যে, বাক্যে, বিদ্যা জাহির করা অনায়াসেই হয়, ব্রহ্মবিদ্যাকে জীবনে ফলিত করাই কঠিন। উমেশ বাবু তাহা সুন্দররূপে করিতে পারিয়াছিলেন।

যাঁহাকে দেখিলে হরিনাম স্ফূর্ত্তি পায়,

তাঁহাকেই বৈষ্ণবপ্রধান বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায়। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে এই কথা বলিয়াছেন। উমেশ বাবুকে দেখিলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিলে হরিভক্তি স্ফূর্ত্তি পাইত। অতএব তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্ম বলি। যাঁহার সহবাসে থাকিলে, ব্রহ্মের শান্তি সম্ভোগ করা যায় ও ব্রহ্মনিঃশ্বাস অনুভব করা যায়, তিনিই আমার মতে ব্রাহ্ম। এই প্রকার ব্রাহ্মই প্রকৃত ব্রাহ্ম, আর সব জাতি-ব্রাহ্ম,—নানা কারণে,—নানা রকম ব্রাহ্ম,—কখনই ব্রহ্মজ্ঞ নহেন॥

উমেশ বাবু সম্পৎসময়েও যেমন আমার খোঁজ খবর লইতেন, আপৎসময়েও তদ্রূপ খোঁজ লইতেন,—বরং বিপৎকালে বেশি খোঁজ লইতেন। যখন আমি জুড়িগাড়িতে হাওয়া খাই ও ত্রিতল-গৃহে বসিয়া সংসার-তবলায় চাটি মারি, তখন অনেকেই হাসিমুখে সর্ব্বদাই আমার খোঁজ খবর লইতে ও লুচি মণ্ডার তত্ব লইতে ব্যস্ত হন। কিন্তু যখন পদ-ব্রজে ধরণীর ধূলি আকাশে উড়াইয়া ভব-ঘুরে বেশে ভূপ্রদক্ষিণ করি, তখন বন্ধু-বান্ধবেরা আর ঘন ঘন আমার দ্বারে আসেন না। তখন আর আমার খোঁজ লওয়া তাঁহারা বিহিত মনে করেন না,—আমাকে মলিন বেশে দেখিলে, মুখ ফিরাইয়া রাস্তার অপর পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যান। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ, রাজনারায়ণ বাবু, রামতনু বাবু, উমেশ বাবু সে জাতীয় বন্ধু ছিলেন না। খবর না দিলেও, উমেশ বাবু স্বয়ং আমাকে খুঁজিয়া লইতেন সকলের প্রতিই তাঁহার এমনই প্রেমের ব্যবহার ছিল। একদা আমি আসাম ও রংপুর বাস-জনিত জ্বররোগে ত্রিশ মাস ভুগি,—সকল চিকিৎসক ও জ্ঞাতিবর্গ আমার আশা ছাড়িয়াছিলেন। ছাড়ি নাই কেবল আমি।

ডাক্তার, কবিরাজ, আত্মীয়, বন্ধু আমাকে ও আমার আশাকে ত্যাগ করিলেও, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যে "আমি বাঁচিবই বাঁচিব,—না বাঁচিলে আমার চলিবে না,—আমার এখানকার কাজ যে বাকি রহিয়াছে।" সম্ভবতঃ যে যে ডাক্তার ও কবিরাজ, সংহারকারী হইয়াও, আমাকে শেষ করিতে পারেন নাই, হয় তো আমিই তাঁহাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য কত বর্ষ জীবিত থাকিব, কে জানে?

এই দীর্ঘকালব্যাপী রোগশয্যার পার্শ্বে কোন বন্ধুকেই দেখিতে পাই নাই। কেবল উমেশ বাবু খুব প্রত্যূষে, এণ্টনী বাগান হইতে ৩৬নং শ্যামবাজারে আমার বাসার দ্বারে যাইয়া কড়া নাড়িতেন ও সেই তাঁহার ক্ষুদ্র ও সুমিষ্ট কণ্ঠে "হেমেন্দ্র" বলিয়া ডাকিতেন।

উমেশ বাবুই সেই মৃত্যুশয্যাতে আমাকে দেখিতে যাইতেন।

হঠাৎ দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সেই অবস্থাতেই আমাকে এক কর্ম্ম প্রদান করিলেন। সে ১৯০৩, অক্টোবর।

কি করি ? এ অবস্থায় বিছানা হইতে উঠিয়া অন্ত ঘরে যাওয়া ক্লেশকর, কি করিয়া একলা দ্বারভাঙ্গা যাই। তখনও বাতে পঙ্গু, প্রত্যহ রোজ ৩টার সময়ে জ্বর আসে, রাত্রি ৯টায় ছাড়ে।

উমেশ বাবু বলিলেন—"তোমার কেহ ভাই বন্ধু সহায় নাই,—থাকিয়াও নাই। বেশ, এ অবস্থায় দ্বারভাঙ্গায় যদি নিতান্তই যাও, তো আমি একজন লোক ঠিক করে দিব, নচেৎ নিজের ছেলেকে পাঠাব, না হয় তো নিজেই যাবো"।

অন্ত লোক স্থির হইল না। তাঁহার বড় ছেলে সুকুমারের তখন শিবপুর কলেজে কৃষিবিদ্যার শেষ পরীক্ষা। উমেশ বাবু বলিলেন "পরীক্ষা পরে হইবে,—সে তোমাকে দ্বারভাঙ্গায় রাখিয়া আসুক। আর ১৫ দিন বাদ পরীক্ষা। না হয় তো আর বছর দিবে।"

এ কথা শুনিয়া আমি অবাক্ !

ছেলে শেষ পরীক্ষায় পাস্ হোক বা না হোক, আর একজন রুগ্ন লোকের সঙ্গে ঘর হইতে প্রায় ৪০০ মাইল দূরে, তাহাকে পঁহুছাইতে যাক্, এ কেবল উমেশ বাবুর মহাপ্রাণই বলিতে পারে, আর পারিতেন আমার পিতা, পিতামহ ও উপরি উক্ত কয়েক জন মহাপুরুষ।

তাহার পর, সেই মহাত্মার "সুপুত্র সুকুমার আমাকে সঙ্গে লইয়া, অশেষ বাধা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক দ্বারভাঙ্গায় লইয়া গিয়া, বাসায় স্থিত করিয়া দিয়া আসিলেন। ভগবৎকৃপায় তিনি পাস্ হইয়া কর্ম্মের উপযুক্ত হইলেন।

কেবল সন্তানকে পরীক্ষা ফেলিয়া সঙ্গে যাইতে দিলেন, তাহাই নহে।

একদিন কাছারীতে বসিয়া পায়ে শেক্ লইতেছি, মহারাজার এক সিপাহি বলিল, —"হুজুর ? কল্‌কাতাসে এক বাবু আয়া।" আমি অম্‌নি তাড়াতাড়ি গাড়ি আনিয়া, বাসায় যাইয়া দেখি, সেই বামাবোধিনীর কপি ও প্রুফের ব্যাগ্, সেই দোয়াৎ ও সেই পৃথিবীপ্রবাসী স্বর্গের দেবতা উমেশচন্দ্র !

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি কি প্রকারে এখানে এলেন ?"

উমেশ বাবু—"তুমি অসম্ভব রোগে ভুগিয়া, মৃতবৎ দেহ লইয়া এলে,—তাই তোমাকে দেখ্‌তে এলাম, কেমন আছ !"

আমি—"আপনি বৃদ্ধ। এত দূর দেশে আমাকে দেখিতে এলেন ? ইহাও কি কেহ করে ?"

উমেশ বাবু—"তোমাকে দেখিবার জন্ত প্রাণটা ব্যাকুল হলো, তাই এলাম, বলি একবার দেখে যাই।"

হায় ! কে জানিত যে, সেই শেষ দেখা। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমাকে দেখিতে ও দেখা দিতে এতদূর, এত কষ্ট ও এত ব্যয় করিয়া, পরে কি কখনও দেখিতে যায় ?

তবে, তিনি পর ছিলেন না।—তিনি আমার আত্মার আত্মীয়,—হৃদয়ের বন্ধু

ছিলেন। আমি তাঁহার শোণিতের সম্পর্কীয় নহি,—পড়ো, শিষ্য, সমবয়স্ক বা অনুগত লোক নহি। বরং অনেক বিষয়ে তাঁহার মতের বিরোধী ছিলাম।

আমাকে ১৯০৬ নবেম্বরে দ্বারভাঙ্গায় দেখিয়া বলিলেন —"হেমু! Thy faith has made thee whole।" দ্বারভাঙ্গা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া এক পোষ্টকার্ডেও ঐ কথা লিখিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"তুমি বিশ্বাসের বলে বাঁচিলে।" তাঁহার যাতায়াতের খরচ দিতে গেলে লইলেন না, বলিলেন "তোমার অনেক খরচ, বরং আমি কিছু দিয়া যাই।"

তাঁহার শেষ পত্র পাইবার দিন কতক পরেই ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে পড়িলাম যে, এই নররূপী দেবতা ভবধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তরে, কর্ম্মান্তরে, সাধনান্তরে গমন করিয়াছেন।

এখনও যেন সেই সুবিমল প্রেমময় মুখখানি দেখিতেছি, তাঁহার স্নেহবাণী শ্রবণ করিতেছি ও স্নুদ্র সস্নেহ কণ্ঠে "হেমু" বলিয়া ডাক শুনিতেছি।

আমি মৃত্যুতে বিশ্বাস করি না।

মৃত্যু নাই, যাহা আছে, তাহা এক, অনন্ত জীবন। সেই অনন্ত জীবন সাগরে, আমি ও তিনি সেই পূর্ব্বকালের মত, অন্যান্য প্রিয় জনগণের সহিত, এক নিত্য প্রেম-লহরী-লীলায় নিযুক্ত রহিয়াছি। সেই ক্ষণিকের, বদ্ধ জীবনের শেষ পরিচ্ছেদ ও অভিনয় এই রঙ্গমঞ্চে সমাপ্ত হইয়া যবনিকার পতন হইলেও,—নূতন পরিচ্ছেদ ও নূতন পত্র খুলিয়াছে, ও নূতন আকাশে, নূতন সূর্য্যের স্নেহ দৃষ্টিতে নিত্য পুরাতন, নূতন লীলা করিতেছেন, ইহাই অনুভব করিতেছি।

তাঁহার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চক্ষু স্নেহাশ্রুকণাসিক্ত হইয়া আসিলেও ভাবি যে, এ অশ্রু তাঁহার জন্য নহে, ইহা আমার বন্ধুহীনতার জন্য ও সমাজের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের জন্য। বামাবোধিনী, মূক-বধির বিদ্যালয়, সিটি কলেজ প্রভৃতি জন-হিতকর কীর্ত্তিকলাপ সাধু উমেশচন্দ্র দত্তের নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ব্রাহ্মসমাজ ও সঙ্গত-সভা এই দেবতার নীরব সাধনার স্মৃতিমন্দির হইয়া চিরদিন আমাদিগকে মানব-আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও চিরবর্ত্তমানতার সাক্ষ্য দিবে।

কোনও একটী অদ্ভুতশক্তি তাঁহার না থাকিলেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণের ও সাধুতার এমন অসাধারণ সমাবেশ কোনও লোকে সহসা দেখা যায় না। যদিও কোন যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও অবতার হইবার যোগ্য মনোভাব তাঁহাতে ছিল না, তথাপি তিনি যে মহাভাব ও মহাপুরুষের একজন নিতান্ত অনুগত ও নিষ্ঠাবান্ ভক্ত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তাঁহার স্মৃতি আমাদের জীবনকে মধুময় ও অমৃতময় করুক।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।
৭১১ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# আমার ভগিনী।

আমার ভগিনী সেকেলে মেয়ে নহেন। তিনি বঙ্গের যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে সময়ে স্ত্রীলোক শিক্ষা লাভ করিলেই অকালে বিধবা হয়েন, এই কুসংস্কারটা একটু নিষ্প্রভ হইয়াছিল। তাই বলিয়া তখনও পল্লিগ্রামে মেয়েদের জন্য কোন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই, এবং অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষারও প্রচলন হয় নাই। তিনি গৃহে বসিয়াই বর্ণ পরিচয়ের পর সহজ সহজ বই পড়িতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটই আমার প্রথম বর্ণ পরিচয় হয়। তিনি সামান্য শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মন উন্নত করিতে পারেন নাই। শিক্ষাতে রুচি মার্জ্জিত হইতে পারে, কিন্তু উহা সকল সময় শিক্ষিত ব্যক্তির চরিত্র আমূল পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। কত সুশিক্ষিত পুরুষ ও মহিলা অতি অপকৃষ্ট চরিত্রের নিদর্শন স্বরূপ হইয়া সাধারণ লোকের অশ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন। যাক, এ অবাস্তব কথায় আর কাজ নাই। আমি বক্তৃতা করিতে পারিতাম। আমার গ্রামের ও চতুষ্পার্শ্বের লোক তাহা জানিতেন। আমি এক সময়ে বিদেশ হইতে গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি। নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম্য বিদ্যালয়ের বালকগণ সংবাদ পাইয়া আমাকে তাঁহাদের বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাহাদের অনুরোধক্রমে যথাসময়ে তাঁহাদের গ্রামে যাইতে উদ্যত হইলাম। তখন সূর্য্য প্রচণ্ড তাপে সকলকে তপ্ত করিতেছিল। আমি এই প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে দূরবর্ত্তী গ্রামে যাইতে প্রস্তুত হইতেছি দেখিয়া ভগিনী প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, ভাল তোমায় জিজ্ঞাসা করি, এঁরা কি তোমায় কিছু দিবেন? তবে তুমি এই বিষম রোদের মধ্যে কেন বাড়ীর বাহির হতেছ"? আমি একটু হাসিয়া বলিলাম "পরের উপকার কর্ত্তে যেয়ে কি আবার কিছু প্রত্যাশা রাখ্‌তে হবে? পরের জন্য খাটিতে গেলেই একটু কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে হয়। একটু স্বার্থ ত্যাগ না কর্ত্তে পার্‌লে কিরূপে পরের উপকার কর্ব্বো?" আমার ভগিনী এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না, খাটিতে হইলেই তাহার পরিবর্ত্তে কিছু ধরিবার ছুঁইবার মত জিনিষ পাইতে হয়, ইহাই তাঁহার বদ্ধমূল সংস্কার। জ্ঞানাভাবই তাঁহার এ সংস্কারের ভিত্তি। তিনি একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, যদি আনন্দলাভই জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার করিতে পারিলে তাহাতে যে বিমল আনন্দ অনুভব করা যায়, লক্ষ কোটি টাকায় সে আনন্দ ক্রয় করিতে পারা যায় না।

আর এক সময় আমি গ্রামে গিয়াছি,

সে সময় একদিন আমার জনৈক পিতৃব্য আসিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি সম্মত হইলাম। আমার ভগিনী আমাকে যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন "ইহাঁরা আমাদের ভিন্ন দলের লোক, "ইহাঁদের বাড়ীতে যাইয়া আমরা সামাজিক ভাবে আহার করিতে পারি না। ওরূপ করিলে আমাদের দলের লোকেরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে।" আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম "আপনাকেত যাইতে বলা হয় নাই, তবে আপনার ভয়ের কারণ কি আছে?" তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তুমি যে আমাদের লোক, তুমি খাইলেই আমাদের খাওয়া হইল, সমাজ ইহাতে রাগ্‌বে"। আমি সম্প্রদায়ের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলাম, তথাপি দেখিতে পাইলাম আত্মীয়বর্গ আমায় ভুল বুঝিতে দেন। তাঁহারা আরও মনে করিতেন যে, আমি তাঁহাদের হইয়া বিরুদ্ধ দলের সহিত মিশিব না। আমার ভগিনীর এই ভ্রমাত্মক সংস্কার বুঝাইয়া দিবার জন্য বলিলাম "আমি বেদলে লোক, কোন দলেরই নহি। সুতরাং যিনি আমাকে ডাকিবেন, আমি তাঁহারই বাড়ী যাইব। ইহাতে যদি আপনারা বিপদাপন্ন মনে করেন, তবে আমার সঙ্গে খাওয়াই ভাল"।

ভগিনী নিরুপায় ভাবিয়া আর বাঙ্‌-নিষ্পত্তি করিলেন না।

আর এক সময় বাড়ী যাইলে পর তিনি একদিন কথোপকথন করিতে করিতে বলিলেন "তোমাদের সকলই ভাল, তবে যে জাতটা মান না, সকল জাতের হাতে খাও, এটাই তোমাদের মন্দ"। আমি বলিলাম "কেন আপনারাও ত খেয়ে থাকেন"। অমনি তিনি বাধা দিয়া বলিলেন "ছি ছি অমন কথা বল না, আমরা হিন্দু হয়ে, বামুন হয়ে, সব জাতের হাতে খেয়ে থাকি, এ মিথ্যে কথা।" আমি একটু হাসিয়া বলিলাম "মিথ্যা কথা নয়? আপনি পুরীতে জগন্নাথ ক্ষেত্রের কথা জানেন না কি? শুনেছি তথায় বামুনে চাঁড়ালে ভেদ নাই। বাজারে অন্ন বিক্রয় হয়, সকল জাতিই তাহা ছুঁইতে পারে। কেহ তাহা লইতে ঘৃণা কল্লে পাপ হয়? এ কথা সত্য নয় কি।" তিনি ভক্তিরসমিশ্রিত স্বরে উত্তর করিলেন "সেখানে যে জগন্নাথ স্বয়ং রয়েছেন, সুতরাং সেটা ধর্ম্মক্ষেত্র। সেখানে সব জাতির ছোঁয়া অন্ন খেলে পাপ নাই, তাই বলে কি যেখানে সেখানে খাওয়া যেতে পারে"? আমি সুযোগ বুঝিয়া জাতিভেদের অসারতা তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলাম; বলিলাম, "আপনার জগন্নাথ কেবল পুরী ক্ষেত্রেই আবদ্ধ, আমার জগন্নাথ জগদ্‌ব্যাপী, সর্ব্বস্থানেই আছেন, এই জন্যই তাঁহার নাম জগন্নাথ হয়েছে। তিনি যে স্থানে, সে স্থানে যদি জাতিভেদ না থাকে, তাহা হইলে জগতের কোন স্থানেই জাতিভেদ থাকতে পারে না"। তিনি আমার যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া নির্ব্বাক রহিলেন।

উপরি-উক্ত কয়টি ঘটনাই আমার ভগিনীর সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচায়ক, কিংবা তাঁহার গভীর তত্ত্বজ্ঞানের অভাব প্রকাশ করিতেছে। যাহার হৃদয় উদার হইয়াছে, সে ব্যক্তিমাত্রকেই আপনার ন্যায় ভাল বাসিবে। সে আপনাকে কষ্ট দিতে যেমন প্রস্তুত হয় না, অপরকে কোন রূপ ব্যথা দিতেও তাহার মন অগ্রসর হইবে না। প্রসিদ্ধ চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ"—যে আপনার ন্যায় সর্ব্বজীবকে দর্শন করে অর্থাৎ প্রেম করে, সেই পণ্ডিত অর্থাৎ জ্ঞানী। যীশু খ্রীষ্টও ঠিক সেই কথা বলিয়া গিয়াছেন "Love thy neighbour as thyself"—তোমার প্রতিবেশী অর্থাৎ অপর ব্যক্তিকে আপনার ন্যায় ভাল বাসিবে। এইটি তিনি ধর্ম্মের একটি শ্রেষ্ঠ উপদেশ মনে করিতেন। "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকং"—উদারচরিত্র ব্যক্তিদিগের নিকট বসুধাই কুটুম্ব। পরকে আপনার মত দেখা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। মানুষের স্বভাব জানিতে হইলে বালক ও অসভ্য জাতির স্বভাব পরীক্ষা করিতে হয়। তাহাদের মধ্যে আমরা আত্মপ্রেমের ষোল আনা খেলা দেখিতে পাই, তাহারা স্বার্থকেই বড় দেখে, পরের জন্য স্বার্থকে বলিদান করা তাহাদের জীবনে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া বিশ্বজনীন প্রেমের আবাসভূমি করিতে হইলে সৎশিক্ষা ও বিধিমত অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়। কেহ মাতৃজঠোর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই উদারপ্রেমিক হইতে পারে না। এজন্য আমার ভগিনীর হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যব্যঞ্জক ঘটনা কয়টি প্রকাশ করিলেও তাঁহাকে তজ্জন্য দোষী মনে করি না। উপযুক্ত অবস্থায় পড়িয়া হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনের সুবিধা পাইলে তাঁহারও সংকীর্ণতা অপনোদিত হইত। তাঁহার সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা তাঁহার তাদৃশ প্রেমানুশীলনের বিরোধী ছিল। যে পরিবারে স্বার্থের ষোল আনা বিকাশ, যে সমাজে সংকীর্ণতা এবং দলাদলির রাজত্ব, সে পরিবারে ও সে সমাজে বর্দ্ধিত বালক বালিকা উদার চরিত্র লাভ করিতে পারে না। সুতরাং যদি কাহাকেও বিশ্বজনীন প্রেমের দীক্ষায় দীক্ষিত করিতে হয়, তাহা হইলে অগ্রে পরিবার ও সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। উদার লোকদিগের সংসর্গে পড়িলে লোক উদার হয়, তদ্বিপরীত সংসর্গে লোকে তদ্বিপরীত স্বভাব প্রাপ্ত হয়। যে সমাজে উদার লোকের সংখ্যা কম এবং সংকীর্ণ লোকের সংখ্যা বেশী, সে সমাজে উদারচরিত্র লোকদিগকেও আত্মরক্ষার জন্য বিষম সংগ্রাম করিতে হয়। দুর্ব্বল ও সংকীর্ণ প্রকৃতির লোকদিগের সমধর্ম্মীদিগের সহিত মিলিবার জন্যই আকাজ্ক্ষা জন্মে, সুতরাং সমাজকে সমগ্রভাবে উদারতার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইবার প্রয়োজন নাই অথবা এরূপ করিয়া বিশেষ

ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। সমাজকে আকর্ষণ করিতে হইলে পরিবারগুলি সংশোধিত করিতে হইবে। কারণ সমাজের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নাই, পরিবারসমষ্টিই সমাজ। সুতরাং ব্যষ্টিভাবে পরিবারের লোক সকল উদার-প্রেমিক না হইলে সমষ্টিভাবে সমাজে সদ্‌দৃষ্টান্ত থাকিতে পারিবে না। তাই বলি আমাদের পরিবারই এই সংস্কারের প্রথম সোপান, তাহা হইতেই সংস্কার আরম্ভ করিতে হয়।

শ্রীচণ্ডীকিশোর কুশারি।

---

## ঈশ্বর নানারূপে কল্পিত।

ঈশ্বর কার্য্যভেদে এই জগতে বহুরূপে ও বহুগুণে কল্পিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের রূপকল্পনাভেদে যে সকল দেবমূর্ত্তি জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্তই ঐশ্বরিক গুণ ও ক্রিয়াদি অনুধ্যান ও পূজা করণের তাৎপর্য্য, কেবলই সাধকদিগের ধারণার উন্নতি মাত্র। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব প্রভৃতির সাধনমতে ঈশ্বর সাধনার ধন হইয়া জগতে নানারূপে অর্চ্চিত হইতেছেন। প্রত্যেক মূর্ত্তিকল্পনার ভাব বোধ হয় অতাল্প লোকেই অবগত আছেন। প্রত্যেক মূর্ত্তির যে এক একটী নিগূঢ় ভাব আছে, তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম জন্য এই স্থলে দুই চারিটী মূর্ত্তির কিঞ্চিন্মাত্র ঐশ্বরিক ভাব প্রকাশ করা যাইতেছে। মনে কর, উপাসক যদি শাক্ত হন, তাহা হইলে তিনি দুর্গা-মূর্ত্তি ভাবনা করিলেই তাহার পর ব্রহ্মের অর্চ্চনা হয়। 'দুর্গা' এই নামটী উচ্চারণ করিলেই দশভুজা, গৌরাঙ্গী, ত্রিনয়না, সিংহারূঢ়া, ও অস্ত্রাদিহস্তা একটী প্রকৃতমূর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ ঐ দুর্গামূর্ত্তি ঈশ্বরের মায়া-শক্তির রূপান্তর মাত্র। ঈশ্বর এই জগতের সৃষ্টি কল্পনা করিয়া আপনার চৈতন্য ঐ মায়া-শক্তিতে আরোপ করিয়াছিলেন। মায়া, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যা ও অবিদ্যাভাবে এই সংসার প্রকাশ করিয়া পালন করিতেছেন। ঈশ্বর আপনার স্বরূপ মায়াতে আরোপ করিয়াছেন বলিয়া মায়া স্ত্রীরূপে কল্পিতা হইয়াছেন। জগতের দশ দিকেই মায়া অবস্থান করিয়া জগৎ শাসন ও উদ্ভাবন করিতেছেন। এই মায়ার ভাব প্রদর্শনকরণার্থ দুর্গানাম্নী মূর্ত্তির জগতে প্রকাশ। দুর্গার দশ হস্ত দশ দিক্, দশহস্তস্থিত অস্ত্রশস্ত্রাদি জীবাত্মার উপকরণ স্বরূপ দশ ইন্দ্রিয়, ত্রিনয়ন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ, অসুর রিপু, সিংহ বল, এবং সর্প চৈতন্য-স্বরূপ। ঈশ্বরের মায়া জগতে কিরূপে বিরাজিত আছে, তাহা এই দুর্গামূর্ত্তিতে অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হয়। দুর্গাপূজার মন্ত্র সকলও

সাধকের সাধনার উপদেশ মাত্র। বস্তুতঃ যে নিত্যা, অদ্বিতীয়া, তেজোরূপা, সমানাকারা প্রকৃতি প্রভৃত প্রজা সৃষ্টি করিতেছেন, নিত্য বিজ্ঞানাত্মা সেই প্রকৃতির সেবা করিয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধকার পরিত্যাগ করেন। আত্মা প্রকৃতির আশ্রয়ে ভোগ্য বস্তু ভোজ্য করিয়া আচার্য্যাদির উপদেশবাক্যে কাম্যকর্ম্মাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন। অধুনা কল্পমাহাত্ম্যে যে তামসিক ভাবে সেই প্রকৃতির দুর্গামূর্ত্তি সকল অর্চ্চিত হয়, তাহার অন্তরে পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্মভাব সকল বিদ্যমান রহিয়াছে।

## কালী রহস্য।

উপাসকদিগের কার্য্যসাধনার্থ গুণ ও ক্রিয়ানুসারে সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে। শ্বেত, পীতাদি বর্ণ সকল যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেইরূপ সর্ব্বভূতই (কালশক্তি) কালীতে প্রবিষ্ট হয়। এই নিমিত্ত যোগিগণের হিতকারিণী সেই নির্গুণা নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। তিনি নিত্যা, কালরূপা, অব্যয়া ও কল্যাণস্বরূপা। তাঁহার ললাটে চন্দ্রকলা-চিহ্ন অমৃত প্রযুক্ত কল্পিত হইয়াছে। যেহেতু তিনি নিত্য স্বরূপ চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি দ্বারা কালসম্ভূত নিখিল জগৎ সন্দর্শন করেন, এই জন্য তাঁহার নয়নত্রয় কল্পিত হইয়াছে। তিনি যাবতীয় প্রাণীকে গ্রাস করেন ও কালদণ্ড দ্বারা চর্ব্বণ করেন বলিয়া সর্ব্ব প্রাণীর রুধিরসমূহ সেই মহেশ্বরীর রক্তবসনরূপে কল্পিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে জীবগণকে বিপদ হইতে রক্ষা এবং তাহাদিগকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রেরণ করা তাঁহার বর ও অভয় রূপে কথিত হইয়াছে। তিনি রজোগুণজনিত বিশ্বে অধিষ্ঠান করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি রক্তকমলাসনস্থিতা রূপে কল্পিত হইয়াছেন। জ্ঞান-স্বরূপা, সর্ব্বজনের সাক্ষিস্বরূপিণী সেই দেবী মোহময়ী সুরাপান করিয়া ক্রীড়াকারী কাল কর্ত্তৃক সমুদ্ভূত এই জগৎকে দর্শন করিতেছেন। অল্পবুদ্ধি ভক্তগণের হিতানুষ্ঠানের নিমিত্ত উক্ত প্রকার গুণানুসারে সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে।

## কালী মূর্ত্তির আর একটী নিগূঢ় অর্থ।

শাস্ত্রানুসারে ভগবানের সর্ব্বব্যাপক চৈতন্য অংশ বা পুরুষাংশটী নিতান্ত নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ, তাহার কোন প্রকার ক্রিয়া নাই এবং কোন প্রকার গুণও নাই। যত কিছু ক্রিয়া, যত কিছু গুণ, সমস্তই তাঁহার প্রকৃতি বা মায়া অংশের। তাঁহার সেই নিষ্ক্রিয় চৈতন্যাংশের বক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী শক্তি

অনন্ত জগতের নির্ম্মাণাদি কার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন। শিবের বক্ষে কালী এই গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। শিব তাঁহার চৈতন্যের প্রতিমূর্ত্তি, আর কালী তাঁহার মায়াংশের প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার পুরুষাংশ বা চৈতন্যাংশ শববৎ নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া আছেন। মায়া সমস্ত গুণসম্পন্ন ও সক্রিয়, তাই তিনি সাধকের নিকট সক্রিয় ও সগুণ ভাবে নৃত্য করিতেছেন।

চৈতন্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ, সুতরাং নিতান্ত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, তাই কালী মূর্ত্তির পদ-তলবর্ত্তী শিবও নিতান্ত নির্ম্মল, শ্বেতবর্ণ, শুদ্ধ স্ফটিকসন্নিভ। মহামায়া স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ নহেন, চৈতন্যের সাহায্যেই তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাই তিনি চৈতন্যের নিকটে অন্ধকার কালিমবর্ণা, তাই কালী কৃষ্ণবর্ণা সাজিয়া বিরাজ করিতেছেন।

শবশিব এবং মহামায়া দিগম্বরীবেশে থাকিয়া দেখাইতেছেন যে, তিনি সর্ব্ব-ব্যাপক বস্তু, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই গর্ভে অবস্থিতি করিতেছে, সুতরাং আর তাঁহাকে কিসের দ্বারা আবৃত করা যাইতে পারে? তাঁহা হইতে বৃহৎ বস্তু না হইলে তাঁহাকে আবৃত করা যায় না, সুতরাং তাঁহার দেহের আবরক স্বরূপ বস্ত্রাদি কিছুই নাই। কালী উলঙ্গিনী, কেবল ইহাই নহে, তিনি এই বেশধারিণী হইয়াও দেখাইতেছেন যে, তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু, তাঁহা হইতে অতিরিক্ত আর কিছুই নাই, তিনিই সমস্ত-স্বরূপা, সুতরাং আর লজ্জা হইবে কাহাকে দেখিয়া? নিজেকে দেখিয়া, কি নিজের লজ্জা হইতে পারে, সুতরাং তাঁহার লজ্জা নাই, লজ্জা রক্ষার নিমিত্তই বস্ত্র পরিধান করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার বস্ত্র নাই।

তৃতীয়তঃ, কালী এই বেশে সাজিয়া, ইহাও দেখাইতেছেন যে, তাঁহার কোনও প্রকার অজ্ঞানতা নাই, সর্ব্বদাই তাঁহাতে পরিপূর্ণ বিবেক জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে। লজ্জাদি গুণ বিকৃত জ্ঞানের ফল, যাঁহার পূর্ণ মাত্রায় বিবেক থাকে, তাঁহার লজ্জা আসিতে পারে না, দেহাভিমান এবং স্ত্রীত্ব পুরুষত্বাদি বিকৃত জ্ঞান হইতেই লজ্জা বোধ হইয়া থাকে, তাঁহার এইরূপ বিকৃত জ্ঞান নাই, লজ্জাও নাই, সুতরাং বস্ত্র পরিধানও করেন না।

মহামায়া সাম্যাবস্থাপন্ন ত্রিগুণময়ী। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ তাঁহাতে অবিকৃত ভাবে বিরাজ করে, তাহাই তিনি এই কালিকা মূর্ত্তিতে দেখাইতেছেন। দক্ষিণ করযুগলের দ্বারা বর এবং অভয় প্রদানের দ্বারা তাঁহার মধ্যে যে সত্ব-সমুদ্ভূতা অতুল শান্তি ও অকৃত্রিম করুণা বিরাজ করিতেছে, তাহা দেখাইতে-ছেন। আর বাম হস্তে বিধৃত অসি ও মুণ্ড দ্বারা দেখাইতেছেন যে, তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় রজোগুণও আছে। সত্ব এবং রজোভাব প্রকাশের সঙ্গে তমোভাব প্রকাশ করা সম্ভবে না, তাঁহার পক্ষে সমস্তই সম্ভব হইলেও আমাদের

বুঝিবার পক্ষে তাহা সম্ভবে না। তাই কালিকা রূপের মধ্যে তমোভাবপ্রকাশক কোন চিহ্ন ধারণ করেন নাই, কিন্তু বাস্তবিক ইঁহার মধ্যে তমোগুণও পূর্ণ মাত্রায় আছে। এইরূপে তিনি সমভাবাপন্না।

কালীমূর্ত্তির লোল জিহ্বা ও করালদংষ্ট্র মুখভঙ্গিমা দ্বারা প্রবল রজোগুণের ভাব প্রকাশ পাইতেছে, আবার হাস্যভাবযুক্ত অধর-পল্লব দ্বারা অতুল সত্বগুণ সমুদ্ভূত শান্তি ও সন্তোষের ভাব বিরাজ করে।

তিনি ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ বিরাটদেহধারিণী, এবং সেই দেহে এই দৃশ্যমান চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নিই তাঁহার নেত্রস্বরূপে গণ্য, তাই তাঁহার তিন প্রকার জ্যোতির্যুক্ত তিনটী নয়ন। একটী নয়ন চন্দ্রের ন্যায় শীতল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছে, আর একটী নয়ন সূর্য্যের ন্যায় তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ ছড়াইতেছে। আর একটী নয়ন অগ্নির ন্যায় পাণ্ডুর তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিতেছে।

কালী পূর্ণমাত্রায় বিবেকিনী, তাঁহার ভ্রান্তি জ্ঞানের লেশও নাই, তাই ভ্রান্তি জ্ঞান বিজৃম্ভিত কেশ বিন্যাস লালসা বিহীনা, সুতরাং তাঁহার কেশে বিন্যাসাদি কিছুই নাই, তিনি মুক্তকেশী।

ইহাও এক কথা বটে যে, ভক্ত উপাসকের নিকট পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিতে পারিলেই ভক্তগণ কৃতার্থ হইতে পারেন, যোগী ঋষিগণ তাহারই ধ্যানারাধনা করিয়া থাকেন। কালীর আপাদতলবিলম্বিত কেশপাশ এই উপদেশ প্রদান করিতেছে। কেশকলাপ মস্তক হইতে পদতলে আসিয়া যেন দেখাইতেছে যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অপেক্ষা পদযুগলের মূল্য অধিকতর, তাই তিনি মুক্তকেশী।

মুণ্ডমালা দ্বারা এই ভাব প্রকাশ পায় যে, সমস্ত ভাষার মূল কারণ বা মস্তক স্বরূপ অকারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণ (মাতৃকা বর্ণ) তাঁহার এক একটী মন্ত্র বা নাম স্বরূপ। মন্ত্র বা নাম তাঁহার নিতান্ত প্রিয় সামগ্রী, তাই তিনি সেই পঞ্চাশৎ-বর্ণাত্মক পঞ্চাশৎ মুণ্ডের মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া এই ভাবটী প্রকাশ করিতেছেন যে, কত শত ব্রহ্মা অতীত হইয়া যান, কিন্তু জগৎ-প্রসূতি মহামায়া তাহার সাক্ষী স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছেন।

কালী শ্মশানে বাস করিয়া ইহাই দেখাইতেছেন যে, অনন্ত জগৎপ্রসূতি সেই পরমেশ্বরই কেবল একমাত্র আমাদের অন্তের বন্ধু, এবং তিনি সর্ব্বান্তে অবস্থিতি করেন, আর শ্মশানই সমস্ত বিকাররহিত স্থান, পরমেশ্বর ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত অট্টালিকা ভোগাদি-লালসা-পরিশূন্য, তাই তিনি শ্মশানে বিচরণ করেন।

## কত কাছে।

দয়াময়! প্রেমময়! জীবনবল্লভ!
হৃদয়ের কত কাছে করিছ বিরাজ
নীরবে গোপনে তুমি! সপুলকে আজ
করিতেছি মর্ম্মে মর্ম্মে যেন অনুভব!
তপনের খর রশ্মি, চাঁদের জোছনা,
তারকার ক্ষীণ প্রভা, মলয় মাধুরী,
কুসুমেরচারু হাসি, কাকলি-চাতুরী,
কত কাছে আছ তুমি করিছে সূচনা।

শান্তির আলয় তুমি, তব এ ধরণী
কত শান্তি, কত তৃপ্তি করিছে প্রদান!
স্নেহ-প্রেম-দয়া প্রীতি দিবস-রজনী
তুমি আছ কত কাছে দিতেছে সন্ধান!
জন্ম-জন্মান্তর যদি কর্ম্মে অনুসরি
সঙ্গে সঙ্গে রহ তুমি কত কাছে হরি!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

---

## ৺উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

### ঠাকুর মাতা।

ঠাকুরমাতা স্বর্গীয়া শশিমুখী ২৪ পরগণার কাটাবেণে গ্রামে বসুবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা করঞ্জলীর প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের কন্যা। এই কাটাবেণে গ্রামে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা বাস করিতেন। পিতামহ ষষ্ঠীচরণ দত্ত শৈশবে পিতৃহীন হইয়া তাঁহার কুটুম্ব মজিলপুরের দত্ত জমীদারদিগের সরকারে আজীবন কর্ম্ম করেন। তিনি উক্ত শশিমুখীকে বিবাহ করিয়া আত্মীয় বসুপরিবারের বাটীর এক অংশে বাস করেন। ইহাঁদিগের কয়েকটী পুত্র কন্যা হয়, তন্মধ্যে আমার পিতা ৺হরমোহন দত্ত ব্যতীত আর সকলে বাল্যকালেই পরলোক গমন করেন। পিতামহ বিশ্বাসী, কর্ম্মনিষ্ঠ ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। জমীদারদিগের শরিয়ার আবাদে কাজ করিতে করিতে একদিন ডাকাইত-দিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তিনি তথাপি তহবিলাদি পরিত্যাগ না করিয়া সাহসের সহিত তাহা রক্ষা করেন। এজন্য ডাকাইতদিগের কর্ত্তৃক প্রহারিত ও বিশেষ নিগৃহীত হন। পিতামহী অনেক শোকতাপে পাগলের মত হইয়াছিলেন, আবার স্বামীর এই দুর্ঘটনায় উন্মত্ত-প্রায় হন। জমীদারেরা তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন ও পরিবারের খোর পোষের জন্য কয়েক বিঘা জমী দান করেন। পিতামহী সর্ব্বদাই বলিতেন "ও রে আমার অর্থ বলে বোধ ছিল না"। স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ তিনি সকলই ব্যয় করিয়া ফেলিতেন, কল্য কি খাইবেন তাহার সংস্থান রাখিতেন না।

তাঁহার একমাত্র পুত্র আমার পিতাও বাল্যকালে পিতৃহীন হন। পাঠশালের শিক্ষালাভ করিয়া দত্ত জমীদারের সরকারে গোমস্তাগিরী কর্ম্ম লাভ করেন। পিতা অতি নম্র, ধীর, মিতাচারী, পরোপকারী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি প্রথম যে সংসার করেন, তাহা গত হয়। পরে আমার মাতা সর্ব্বমঙ্গলাকে বিবাহ করিয়া ঘরসংসার করেন। বন্ধুদিগের বাটীতে অবস্থিতিকালে সর্ব্বপ্রথমে আমার একটী ভগিনী হইয়াই মৃত হয়। পরে জ্যেষ্ঠ সহোদর অভয়াচরণ দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পিতামহীর বড় আদরের ধন হইলেন এবং তাঁহাকে "চণ্ডীর পুথী" বলিয়া কোলে করিয়া থাকিতেন। আমার জন্মের পূর্ব্বে পিতা আমাদিগের বর্ত্তমান ভদ্রাসন ক্রয় করিয়া তথায় গৃহ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে থাকিবার ব্যবস্থা করেন। মাতা লক্ষ্মীর অবতারবিশেষ ছিলেন এবং এই গৃহলক্ষ্মীর গুণে দিন দিন তাঁহার সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমে আমি ও আমার কনিষ্ঠ সহোদর এবং কনিষ্ঠা দুই ভগিনীর জন্ম হইল। পিতা তিন পুত্রের জন্য বহু পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া ক্রমে তিনখানি চক করিলেন। আবাদ সকল হইতে আমাদের বাটীতে বিস্তর ধান্য ও মৎস্যাদি আসিত, অতিথি অভ্যাগতেরও অভাব ছিল না। আমাদের জ্ঞাতি ও অধিকাংশ আত্মীয় কুটুম্বের বাস গঙ্গাহীন মুড়াগাছা অঞ্চলে। তাঁহারা গঙ্গাস্নানে, দোল-দুর্গোৎসবে ও অন্যান্য পালপার্ব্বণে আসিয়া আমাদের বাটীতে বাস করিতেন। তদ্ভিন্ন ঐ অঞ্চলের যাহার মারাত্মক পীড়া হইত, তাহাকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্য আমাদের বাটীতেই আনা হইত। আমার মাতা প্রাণপণে ইহাদিগের সেবা শুশ্রূষাদি করিতেন। পিতামহী পাগলস্বভাব থাকায় কখনও ভাল মনে আছেন, সকলকে আদর যত্ন করিতেছেন, কখনও মেজাজ খারাপ হইলে কেবল বকুনি ও লোকের উপর ঝাল ঝাড়া। তিনি মাতার শমনদণ্ড হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহা দ্বারা মাতা অগ্নি-পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইতেন।

(ক্রমশঃ)

---

## পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। বলা মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত সংযুক্ত করিয়া পান করিলে মূত্রাতিসার বিনষ্ট হয়। মহাবলা চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি এবং বিপথগামী বায়ু স্বপথগামী হয়। অতিবলা চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে প্রমেহ আরোগ্য হয়।

২। ধুতুরা পাতার রসের সহিত অথবা পানের রসের সহিত পারদ মিশ্রিত করতঃ লেপন করিলে থুকা (উকুন) বিনষ্ট হয়।

৩। দাড়িম-পুষ্পের রস, আমের আঁঠীর রস কিম্বা দূর্ব্বার রস কিম্বা পলাণ্ডুর (পেঁয়াজের) রসের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

৪। কণ্টকারীর কাথ প্রস্তুত করতঃ পিপুলচূর্ণ সহযোগে পান করিলে সর্ব্ব প্রকার কফ বিনষ্ট হয়। মধু সহযোগে পান করিবে।

৫। অশ্বত্থ বৃক্ষের ছাল শুষ্ক করতঃ অগ্নিতে পোড়াইবে, পরে উহা জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করিলে অতি দুঃসাধ্য বমি রোগ নিবারিত হয়।

৬। ত্রিফলা, দারুহরিদ্রা, রাখালকাশা, ও মুস্তকা ইহাদের কাথ করতঃ তাহাতে হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্ব প্রকার প্রমেহ নষ্ট হয়।

৭। করবীর মূল জল সহযোগে পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে অসাধ্য উপদংশও আরোগ্য হয়।

৮। সহদেবীর (গণ্ডোৎপলের) মূল মস্তকে (ধারণ) বন্ধন করিলে জ্বর নষ্ট হয়।

৯। সজিনার বকল ও পত্র বেদনা প্রশমনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। সজিনার বীজের নস্য লইলে শিরোরোগ নষ্ট হয়।

১০। নারিকেল পাতলা করিয়া কাটিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে, পরে গোদুগ্ধ, চিনি ও গব্য ঘৃত সহ একত্র মিলিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। ইহাকে নারিকেল-ক্ষীর বলে। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, গুরু, মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

১১। ভাজা-সিদ্ধি-চূর্ণ মধুর সহিত রাত্রিতে ভক্ষণ করিলে অনিদ্রা, অতিসার, গ্রহণী, ও অগ্নিমান্দ্য রোগ নষ্ট হয়।

১২। পিপলীচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর, প্লীহা, ও হিক্কা নষ্ট হয়। ইহা বালকদিগের পক্ষেও প্রশস্ত।

১৩। রসোন বাটিয়া তিলতৈল ও সৈন্ধব সহযোগে প্রাতে সেবন করিলে বিষম জ্বর এবং নানা প্রকার বাত রোগ নষ্ট হয়।

১৪। শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, এবং গুড় সমভাগে পেষণ করতঃ উষ্ণ জলে, পুরাতন মদ্য বা তক্রের সহিত পান করিলে তীব্র-তর শীত-জ্বর বিনষ্ট হয়।

১৫। গুলঞ্চচূর্ণ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া উহার ষোল ভাগ, গুড় ষোল ভাগ, মধু ষোল ভাগ এবং ঘৃত ষোল ভাগ সমস্ত একত্র মিশ্রিত করতঃ অগ্নির বলাবল বিবেচনা করিয়া যথা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহাতে মেধাবৃদ্ধি ও ত্রিদোষ নষ্ট হয়, কখনও ব্যাধি, বার্দ্ধক্য, বিষম-জ্বর, মেহ, বাতরক্ত, নেত্ররোগ উপস্থিত হয় না, এবং দীর্ঘ জীবন লাভ হয়।

১৬। রবিবারে অপাঙ্গের মূল সাত

গাছি লাল রঙ্গের সূত্রের দ্বারা কটিদেশে বন্ধন করিলে তৃতীয়ক জ্বর নষ্ট হয়।

১৭। সৈন্ধব অতি সূক্ষ্ম করিয়া জলের সহিত নস্য লইলে নিশ্চয়ই হিক্কা নষ্ট হয়। শুঁঠ চূর্ণ চিনির সহিত মিলিত করিয়া নস্য লইলে অথবা হিঙ্গুর ধূপ দিলেও হিক্কা নষ্ট হয়। বাসক পাতার রস মধুর সহিত সেবন করিলে হিক্কা নিবারিত হয়।

১৮। কৃষ্ণতিলের ২ ভাগ, চিনি ৫ ভাগ, ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সত্বই রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

---

# গিরিধি ব্রাহ্মিকা-সমাজে প্রদত্ত উপদেশ।

রাজর্ষি দায়ুদের গীতের কোন স্থানে "ক্রন্দন" মাংস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এটি বড় ভাবিবার কথা। মাংস যেমন শরীরের পুষ্টিসাধন করে, চিন্তা করিলে দেখিতে পাই প্রকৃতভাবে সরল প্রাণের ক্রন্দনও আত্মার পক্ষে তেমনি পুষ্টিকর। কাঁদিতে পারিলে তো হয়।

যত সেই পরম প্রভুর চরণতলে কাঁদিতে পারিব, তত আত্মার তেজ ও শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যে কেহ প্রকৃতরূপে কাঁদিতে শিখিয়াছে, তাহার আর ভাবনা কিসের? পৃথিবীর লোকমাত্রেই কাঁদে। ধনী ধনক্ষয়ে চক্ষুর জল ফেলিয়া আকুল হয়েন। স্বার্থপর মানুষ আমরা, স্বার্থের মূলে, বাসনার মূলে আঘাত পড়িলে আমরা কাঁদিয়া থাকি। আত্মীয় স্বজনের বিচ্ছেদে প্রাণ আশাশূন্য ও শোকে মুহ্যমান হয়। হৃদয়ের ধন সন্তান হারাইয়া কত শত জননী দিনরাত হাহাকার করিতেছেন। বৈধব্যের যাতনায় কত নারী চির অশ্রুতে বুক ভাসাইতেছেন। মৃত্যু-জনিত শোকের ক্রন্দনে প্রাণ অস্থির হয় নাই বা বুক ভাসে নাই এমন তো কেহ জগতে নাই। কিন্তু রাজর্ষি দায়ুদ সে পার্থিব ক্রন্দনের কথা বলেন নাই। তাঁহার অটল ভক্তি ও গভীর ভাবপূর্ণ গীতের "ক্রন্দন" পার্থিব মায়ামমতা-জনিত ক্রন্দন নয়।

"স্বীয় কৃত অপরাধে বঞ্চিত তব প্রসাদে,
গভীর বিষাদে তাই জীবন হারাই।"

এই অবস্থার পরে প্রাণের ব্যাকুল ক্রন্দন। মানুষ নিজেকে অসহায় অনাথ জেনে, পাপ যন্ত্রণার অন্ধকার দেখে। যখন পতিত-পাবন প্রভুর উদ্দেশে কেঁদে আকুল হয়, তখনই মানবের চক্ষুর জল ফেলা স্বার্থক হয়। দেখ দেখি, কে কি ভাবে দিন কাটিয়েছি। ব্যাকুল ক্রন্দন কাকে বলে তাকি ভেবেছি? ভেবে দেখ, অনুতাপের অগ্নিতে কি হৃদয়নিহিত গুপ্ত পাপ বাসনা-গুলিকে নিক্ষিপ্ত করিতে পেরেছি? প্রাণে ভক্তির অভাব, হৃদয়ের শুষ্ক ভাব, কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য দেখে আত্মপরীক্ষা

করে স্বীয় অযোগ্যতা অনুভব করে কি গোপনে চক্ষুর জল ফেলেছি? কলঙ্কিত জীবনের পাপভারে অবসন্ন শ্রান্ত পথিক আমরা, আমরা কি প্রকৃত কান্নার মর্ম্ম বুঝি? হায় তা যদি বুঝিব তো আজ মলিন হয়ে থাক্‌বো কেন? এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে পুণ্যধামের যাত্রী যাহারা, তাহাদের ক্রন্দনই সম্বল। প্রাণ খুলে পিতার চরণে কাঁদিতে পারিলে আর তো ভয় থাকে না। অনুতাপের অশ্রুতে সেই চরণ ধোয়াইতে পারিলে আর আমাদের কিসের ভাবনা? পাপরোগে জর্জ্জরিত, সংসার-মরুতে তৃষিত, শোক ভয়ে অবসন্ন আমরা। এসো বোন, আমরা ভাল করে রাজর্ষির বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করি।

রাজর্ষি দায়ূদ প্রাচীন কালের এক মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন। জগতে যা কিছু মানবের বাঞ্ছনীয় ও কাম্য বস্তু, তাঁহার তো সে সকলের কিছুরই অভাব ছিল না। ধন, ঐশ্বর্য্যে তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল, বিশ্বব্যাপী যশোমানে তাঁহার নাম উচ্চারিত হইত, কিন্তু পৃথিবীর রাজসিংহাসনে বসিয়া সুখসম্পদের ক্রোড়ে অবিস্থিত থাকিয়াও তাঁর মন তৃপ্তি মানিল না। তিনি ফকিরের মত বীণাযোগে গাহিলেন "ক্রন্দনই আমার সম্বল"। কোথায় তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র, কোথায় তাঁর রণভেরী, কোথায় তাঁর সৈন্য সামন্ত? মহারথী, মহাবীর, দীনবেশে, সামান্য দুঃখী কাঙালের মত, দেবাদিদেব পরম প্রভুর চরণ উদ্দেশে চখের জলে বুক ভাসাইয়া বলিলেন "প্রভু ক্রন্দনই আমার সব।" দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকুলকে বিনাশ করিতে হইলে পিতার নিকট কাঁদিতে হইবে। সকলেরই জানা আছে দুর্ব্বল শিশুর ক্রন্দনই সম্বল। কাঁদিয়া সে জননীর প্রাণকে আকৃষ্ট করে। আমরা দুর্ব্বল পাপরোগে ক্লিষ্ট সন্তান, তেমনি কেঁদে কেঁদে আমাদের স্বর্গীয় জননীর ক্রোড়ে স্থান পাব। শিশুর কান্নায় মার প্রাণ অস্থির হয়, তিনি ছুটে এসে কোলে তুলে সন্তানকে সুস্থির করেন। যা অভাবে চোখে জল, মাতা নিজে বুঝে তার প্রতিকার করেন। আমাদের পরম মাতা পার্থিব মাতা অপেক্ষাও যত্নে আমাদের কান্না শুনেন, বোঝেন। তাঁর চরণে কান্না মানবের একমাত্র মুক্তির সোপান। মানবের আধ্যাত্মিক চক্ষুর উন্মিলনে, প্রাণের ব্যাকুলতায়, স্বীয় কৃত পাপের যাতনায় যে চোখের জল পতিত হয়, যে ব্যাকুল নির্ভরের ভাব আসে, পরম জননী তাহা কখনই উপেক্ষা করেন না। প্রকৃত কথা, যে ব্যক্তি বিষাদপূর্ণ দুর্ব্বল হৃদয়ে ঈশ্বরের শরণাগত হয়, তিনি তাহাকে আনন্দ ও শান্তি প্রদান করেন। স্বীয় শক্তিতে উঠিব, স্বীয় চেষ্টায় সাধুতা লাভ করিব, এ সব অহঙ্কারের কথা। গোপনে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারি কি দুর্ব্বল আমরা। প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতায়, প্রবৃত্তিকুলের উত্তেজনায়, মানুষ কি না অন্যায় করিয়া

থাকে। কিন্তু এত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমরা পরমদেবের বিশেষ করুণায় বুঝিতে পারি যে, আমারা নিজের রক্ষক নিজে নহি, আমাদের উদ্ধার নিজে হয় না। যেই এই ভাব প্রাণে উদিত হয়, অমনি অহঙ্কারী হৃদয় লজ্জায় নত হয়, জ্ঞানাভিমান দূরে পলায়। কি করে তখন বল পাই, কি উপায়ে মোহমায়ার বন্ধন ছেদন করি, পাপশৃঙ্খল মোচন করি, কিসে নবজীবন পাইব, হৃদয়ে কেবল এই চিন্তা আসিয়া আমাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে, চক্ষুতে আপনা হতে জল আসে। কাঁদিয়া তখনি আমরা বলি "আমার কি হবে উপায় দয়াময়"। যত ঐ কথা ভাবিব, ততই এই পাপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত আত্মা, পাপ ব্যাধি জর্জ্জরিত হৃদয় কাঁদিয়া আকুল হবে। অসহায় কাঙ্গাল জ্ঞানে আমরা পিতার চরণ ধরিবার জন্য ব্যাকুল হব।

এসো সকলে মিলে বলি, ভক্তিভরে বলি "মা আমি ছাড়ব না তোমায়, ঐ চরণের ছায়ায় নিলাম শরণ, অধমতারণ আমায় তার দয়াময়"। বলি এস প্রভু কাঁদিবার শক্তি দাও আমাদিগকে, তোমার দ্বারে হত্যা দিতে শিখাও আমাদিগকে"। এ দেশের লোকের বিশ্বাস ঠাকুরের কাছে হত্যা দিলে মনোভিষ্ট সিদ্ধ হয়। আমাদের ঠাকুর যে সর্ব্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় প্রভু পরমেশ্বর। এস কেঁদে তাঁর দ্বারে সবাই হত্যা দিয়ে পড়ি, তিনি সিদ্ধিদাতা, সন্তানের অভাব মোচন করিবেনই করিবেন। যে কান্নায় নবজীবন লাভ হয়, সেই অশ্রুতে পিতার চরণ ধৌত করিতে হবে। জগতের রাজাধিরাজ বলিলেন "প্রভু কান্নাই আমার অন্নপান," অতএব সকলে ভেবে দেখুন এ কান্না কি? রাজ-সিংহাসনে বসে পরমধার্ম্মিক রাজা, জগতে যাঁর কোন অভাব নাই, অতুল যশ, অতুল ঐশ্বর্য্য, তিনি কিনা সব ছেড়ে বীণাযন্ত্র যোগে গাহিলেন "প্রভু কান্নাই আমার সব"। তবে আমাদের এ বিষয় কত গভীর ভাবে ভাবা উচিত তাহা বলা বাহুল্য।

## নূতন সংবাদ।

১। বঙ্গের লাট লর্ড কারমাইকেলের নিমিত্ত ৫০টী অশ্বের প্রয়োজন। সম্প্রতি ৩০টী ক্রয় করা হইবে, পরে আর ২০টী ক্রয় করা হইবে। ইহা ব্যতীত লাট সাহেবের নিমিত্ত ৯ খানি মোটর গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে।

২। সম্প্রতি ডিক্টোগ্রাফ নামে একটী নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রটী এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, ইহা বাটীর যে কোন গুপ্ত স্থানে রাখিয়া, তারযোগে ইহার সহিত সকল গৃহের সংযোগ করিয়া দিয়া কল টিপিলে গৃহের

ভিতরকার সকল কথাবার্ত্তা গ্রামোফোনের ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়।

৩। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অনাথনাথ দেব কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হস্তে ৫০০০৲ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর দুইটী করিয়া স্বর্ণপদক বঙ্গ ভাষায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য প্রদত্ত হইবে। প্রবন্ধরচনায় প্রতিযোগিতা করিতে কেবল মহিলাদিগের অধিকার থাকিবে।

৪। বঙ্গের গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল কলিকাতার সাহিত্য সভার অভিভাবক (Patron) পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

৫। মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে এবর্ডিন বিশ্ব বিদ্যালয় ডি, এল উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছেন।

৬। গঁবর্ণমেণ্ট সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে সি, আই, ই উপাধি দান করিয়াছেন ; এবং ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার রায়কে ডি, এস্‌, সি উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

৭। স্বর্গীয় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি বিডনস্কোয়ারে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স এই প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

৮। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব ব্যারিষ্টার মিঃ টি পালিত মহাশয় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হস্তে নগদ চারি লক্ষ ষাট হাজার টাকা ও তাঁহার পার্শি বাগানের বাড়ী প্রদান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই বাড়ীতে এক বিজ্ঞান-কলেজের প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহার তত্ত্বাবধায়ক-পদে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিতে হইবে এই সর্ত্তে সম্পত্তি প্রদান করা হইয়াছে।

৯। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, জাপানেও চাউলের দাম দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। জাপান হইতে রেঙ্গুনের চাউলের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

১০। বিলাতের ভোটপ্রার্থিনী ২১ জন রমণী জেলে আহার করিতে অস্বীকার করায় তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে একজন রমণী ওয়েষ্ট-মিনিষ্টারের সেণ্টষ্টিফেন হলের জানালা ভাঙ্গিয়াছেন বলিয়া ধৃত হইয়াছেন। ২৬এ জুন রাজা ও রাণী ন্যাসান্যাল কেথিড্রালে যাইতেছিলেন, সঙ্গে মিঃ ম্যাককেন্না ছিলেন, এমন সময় একজন রমণী চিৎকার করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। তিনি রাজা ও রাণীকে রাজনৈতিক অধিকারপ্রার্থিনী রমণীদিগকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। ইনিও ধৃত হইয়াছেন। ভোট-প্রার্থনীগণ বিলাতে বিষম কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁরা কখনও প্রধান মন্ত্রীকে প্রহার করিতেছেন, কখনও

পার্লামেণ্টে সভা গৃহের দরজা জানালা ভাঙ্গিতেছেন, কখনও মন্ত্রিসভার সভ্যদিগকে যথেষ্ট গালাগালি দিতেছেন।

---

# বামারচনা।

## চতুর্থী।*

স্নেহময়ি মাগো হায়!
তোমার চতুর্থী আজ!
অকৃতি তনয়া আমি,
করিতেছি প্রেত-কাজ।

অন্তরের অভ্যন্তরে
বিষাদ কুহেলি ঘোর।
চোখে অশ্রু, মনে স্মৃতি,
অবসন্ন তনু মোর।

আশৈশব পিতৃহীনা,
তাই কত মোরে নিতি,
পিতা-মাতা একাধারে
করিতে মমতা প্রীতি।

করেছ যে স্নেহ-যত্ন,
হৃদয় করি বিদীর্ণ,—
বুকের রুধির দিয়ে,—
দেহখানি করি শীর্ণ!!

অপার্থিব সে স্নেহের
এই কি মা! বিনিময়?
সতৈজস-অন্নজল,
—ফল তিল সমুদায়!

হীনা! আমি, অজ্ঞ আমি,
জানি না বুঝি না কিছু।
এ বস্তু দেহান্ত জীব
পায় কি না পায় পিছু?

জীবের মরণ নাই,
জীব ধ্রুব সত্য মূল।
বিয়োগান্তে মিশে পুনঃ,
সূক্ষ্মে সূক্ষ্ম, স্থূলে স্থূল।

তবে তো আছ মা! তুমি
অসীম অনন্ত-রূপে।
শুধু এ বিয়োগ ব্যথা,
সসীমের মায়া-কূপে!

মাতৃহীন হ'য়ে মোরা
দুটি বোন, এক ভাই।
—করিতেছি হাহাকার
সাশ্রুনয়নে সদাই।

সাধের—স্নেহের তব—
'রবি' 'রাণী' প্রাণ-প্রিয়,
—দৌহিত্র দৌহিত্রী দুটি
কাঁদিছে অসহনীয়!

---

* এই কবিতাটি গত ১৩১৮ সালের ২৮শে ফাল্গুন তারিখে আমার পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া স্নেহময়ী মাতাঠাকুরাণীর আদ্য চতুর্থী উপলক্ষে লিখিত হয়।

—ভাগ্যহীনা লেখিকা।

আহা! তব বৃদ্ধ পিতা
তোমা বিনে জীবন্মৃত!
অকস্মাৎ এ শোকে তাঁর—
স্তব্ধ হৃদি—স্তব্ধ চিত!
পুণ্যের দ্যুতিতে তুমি
উদ্ভাসিয়া মাতৃলোক,
জুড়ায়ে আছ মা! সেথা
জ্বালাময় পুত্রশোক!
মাতৃলোক হ'তে লহ
দীনার উৎসর্গীকৃত
সতিল এ গঙ্গোদক—
অশ্রুনীর-ভোজ্যান্ন-ঘৃত।
উপাস্যা! আরাধ্যা! ধ্যেয়া!
শরণ্যে! বরেণ্যে! মম।
"স্বর্গাদপি গরীয়সি"
গো জননি! নমঃ নমঃ।

শোকাহতা কন্যা—
সুশীলা সুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

---

## শোকোচ্ছ্বাস।

কোথা তুমি আজ?
অৰ্দ্ধ বর্ষ হল গত
কোথা তুমি আজ?
কর্ম্মযোগী ফেলে গেছ
অপূর্ণ যে কত কাজ!
চির তরে মুদে আঁখি
কোন মহাসাধনায়,
সব স্নেহ পাশরিয়া
গেলে দেব! অমরায়।
সংসারের কোলাহলে
শান্তিহীন ছিল প্রাণ,
তাই কি মুদিলে আঁখি
করিতে গো মহাধ্যান।
স্নেহের সন্তানগণে
ফেলে আজি অসহায়,
কোন্ প্রাণে শান্তি পিতা
পাও তুমি অমরায়?
চখের আড়াল হলে
কতই কাতর হতে,
সেই সব ফেলে দেব
গেলে আজি কোন্ পথে?
এত অশ্রু হাহাকার
কিছু কি পশে না হায়,
আকুল আহ্বান এত
সবি কি গো ভেসে যায়?
তুমি বিনা নিরানন্দ
আজি দেব এ ভবন,
অনাথের পিতা ছিলে
'পিতৃ' রূপে ভগবান্।
চরণের চিহ্ন আছে
আজ(ও) দেব প্রতি ঠাঁই,
সকলি সেই সব আছে,
শুধু দেব তুমি নাই!!
এ জগতে তুমি নাই

কেমনে রহিব হেথা,
স্নেহ উপদেশে আর
কে ঘুচাবে হৃদিব্যথা।
কত যে সান্ত্বনা দিতে
কারো কাছে ব্যথা পেলে,
হৃদয় যে ফেটে যায়
তুমি নাই মনে হ'লে।
কত দিনে মুক্তি পাব

দীর্ঘ এ মেয়াদ হতে,
দাঁড়াইব পদতলে
আশীষ লইতে মাথে।
এ জগৎ শান্তিহীন,
তাই গেছ অমরায়,
শান্তিধামে ডেকে নাও
অভাগা এ তনয়ায়।

শ্রীচাঃ দেবী।

---

## ঘোর দুর্দ্দিনে।

(হায়)! জীবনেত রহিল না ভক্তি গৌরব,
কিবা নিদর্শন হেথা তোমার প্রভাব;
যা কিছু আমারি বলে হায়! ধরিয়াছি,
তাহাই গিয়াছে ভেঙ্গে আঁধারে ডুবেছি।

(প্রভু) তোমার ইঙ্গিতে যদি পরাণ জাগিত
কতই স্বরগ ফুল হেথা বিকশিত—।
এ পূর্ণিমা নিশিথিনী ঢালে যে আঁধার
নয়ন হেরিতে নারে স্বরগ দুয়ার।
তারকা আকারে মম সাধের মুকুল,
কোথায় ফুটিয়া আছে? তাই হয় ভুল।

---

## স্মৃতি।

যতদিন শুভ্র ফুল ছিলে এ সংসারে
সুতৃপ্ত করেছ শত পিয়াসি পরাণ,
মুমূর্ষু পরাণে শত দিয়েছ জীবন,
সেবাই করিয়াছিলে জীবনের সার,
তোমা হেরে ভুলেছিনু অশনিপ্রহার।
পরীর মতন উড়ে—এসে মম কোলে,

পরীর মতন পুনঃ অমরাতে গেলে,
তোমার পবিত্র আভা অতুল সুষমা
নয়নসমুখে ভাসে লো দেবীপ্রতিমা।
ঊর্দ্ধে চেয়ে তোমা হেরে লভেছি সান্ত্বনা
ধরায় কাহার সাধ্য মুছে এ বেদনা।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।

১৩।৩ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 588. August, 1912.

" কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। "

কন্যাকেও পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৯ বর্ষ। ৫৮৮ সংখ্যা। | শ্রাবণ, ১৩১৯। | ১০ম কল্প। ১ম ভাগ।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

**লাট সাহেবের সিমলা যাত্রা**—শুনা যাইতেছে, আগামী ১লা সেপ্টেম্বর বঙ্গের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল সিমলায় যাত্রা করিবেন, এবং ৮ই সেপ্টেম্বর তথা হইতে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিবেন, এইরূপ স্থির হইয়াছে।

**লর্ড কারমাইকেল বাহাদুরের কলিকাতার নানাস্থান পরিদর্শন**—লর্ড কারমাইকেল ও লেডী কারমাইকেল দার্জ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কলিকাতার নানাস্থান পরিদর্শন করিতেছেন। মিউজিয়ম, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির, ফ্রিস্কুল, সিটি কলেজ, রিপন কলেজ, হিন্দু হোষ্টেল প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়াছেন। লেডী কারমাইকেল হিরণ্ময়ী দেবী প্রতিষ্ঠিত মহিলা শিল্পাশ্রম পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। লর্ড ও লেডী কারমাইকেল মেডিকেল কলেজও পরিদর্শন করিয়াছেন। লেডী কারমাইকেল শিশু রোগীদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন।

**রমণীর পাণ্ডিত্য**—চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত জগৎপুর আশ্রম হইতে নিম্নলিখিত রমণীগণ সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (১) ন্যায় দর্শনে শ্রীমতী সরলা সুন্দরী, সাংখ্য দর্শনে শ্রীমতী যোগেশ্বরী, ব্যাকরণে শ্রীমতী যোগপ্রভা দ্বিতীয় বিভাগে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় রমণীদিগের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আশা করি, রমণীগণ মাতৃভাষায় দিন দিন অধিকতর পাণ্ডিত্য লাভ করিবেন।

**দার্জ্জিলিং মহারাণী বালিকা বিদ্যালয়**—দার্জ্জিলিংএ অবস্থিতিকালে লেডী কারমাইকেল তথাকার মহারাণী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে ছোট আদালত—দিল্লীতে শীঘ্রই একটী ছোট আদালত প্রতিষ্ঠিত হইবে, এইরূপ শুনা যাইতেছে।

লর্ড ক্লাইবের প্রতিমূর্ত্তি—লর্ড ক্লাইবের প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতায় আসিয়া পৌছিয়াছে। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরে এই মূর্ত্তি রক্ষিত হইবে।

বাঙ্গালীর সম্মান—গত বৎসর যখন আমাদের সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী কলিকাতায় আগমন করেন, সেই সময় তাঁহারা একদিন আলিপুর পশুশালা দর্শন করিতে যান। আলিপুর পশুশালার অধ্যক্ষ বাবু বিজয় কুমার বসু তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন ও সম্মান সহকারে সকল স্থান পরিদর্শন করান, ইহাতে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বিশেষ প্রীত হন। সম্প্রতি বাবু বিজয় কুমার বসু মহাশয় বিলাতে গমন করিয়াছেন। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বসু মহাশয়কে যথোচিত সমাদর করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত একত্র হইয়া একখানি ফটোগ্রাম তুলিয়াছেন ও তাঁহাকে গলায় বাঁধিবার হীরকখচিত "স্কার্ফ পিন" উপহার দিয়াছেন। ঐ পিনে সম্রাট্ মহোদয়ের নামের আদ্যক্ষর খোদিত আছে। সম্রাটের নিকট বসু মহাশয়ের এই অভূতপূর্ব্ব সম্মানলাভে বঙ্গবাসিমাত্রেই গৌরবান্বিত হইয়াছেন। বসু মহাশয় নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

পানিহাটী শ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম—গত প্রথম রথের দিবস পানিহাটী গ্রামে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দাস, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মল্লিক প্রভৃতির প্রভূত চেষ্টায় উক্ত সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তত্রত্য নারায়ণের সর্ব্ব বিষয়ের অভাব মোচনের চেষ্টা ও সেবা এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। "সাধু যাঁহাদের ইচ্ছা, ভগবান্ তাঁহাদের সহায়।" ইহাঁদের উদ্দেশ্য সফল হউক।

পুষ্পোৎসব—বিগত ২৬শে জুন রাজমাতা মহারাণী আলেকজান্দ্রীয়ার সম্মানার্থ লণ্ডনে এক মহা আনন্দোৎসব হইয়া গিয়াছে। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া গোলাপফুল লইয়া পথে ও সর্ব্ব স্থানে বিচরণ করিয়াছেন। ৪৫০,০০০ টাকার ফুল বিক্রীত হইয়াছে। অনেকগুলি পুরস্কারও প্রদান করা হইয়াছে।

---

# শিশু জীবন ও কিণ্ডার গার্টেন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তবে জননীদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান কি শিশুদিগের সম্পূর্ণ যত্ন ও শিক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ট বোধ হয়? শিশুর ক্ষুদ্র শরীরটী যখন সম্পূর্ণরূপে অন্যের উপর নির্ভর

করিয়া থাকে, তখন উহার মন কি আত্ম-নির্ভর ও আত্ম-পুষ্টি করিতে সক্ষম? প্রসিদ্ধ দার্শনিক জিয়ান পল বলিয়াছেন, জীবনের প্রথম তিন বৎসর শিশুর আত্মা অতি স্বচ্ছ ও নির্ম্মল থাকে, তাহার পর আত্মার দরজা অর্থাৎ বাক্‌শক্তি দ্বারা সে বাহ্য জগতের অনেক বিষয় নিজ মনে অঙ্কিত করে। সেই জন্ত এই তিন বৎসরে উপযুক্ত শিক্ষা দিলে শিশুদিগের বাল্যকালের অনেক মন্দ স্বভাব ও দোষ সংশোধন করিবার আবশ্যক হয় না। শিশু এত দিন পর্য্যন্ত অতি বিশুদ্ধ, সরল ও বাক্যহীন অবস্থায় থাকে, সেই জন্ত ঐ তিন বৎসরে তার পরজীবনের অনেক ভাব ও অভ্যাস স্থিরীকৃত হইয়া যায়। পিতা মাতা শিশু চারাটিকে ঢাকিয়া ছাউনীর নীচে রাখিতে পারেন বটে, কিন্তু বড় বিকাশ-প্রাপ্ত বৃক্ষকে ইচ্ছামত আচ্ছাদন করিয়া রাখা সুকঠিন। সেই কারণে প্রথম শিশুকালের ভ্রমগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর হয়। মানসিক পীড়া শারীরিক ব্যাধির ন্যায় যত অল্প বয়সে জন্মে, ততই তাহা অধিক বিপজ্জনক হইয়া উঠে। বিশেষতঃ, শিশু যত বড় হইতে থাকে, ততই তাহার স্বভাব-সংশোধন অধিকতর আয়াসসাধ্য হইয়া পড়ে। আর সমস্ত জীবন শিক্ষার কাল ধরিলে ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, পরিণত বয়সে সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া এক জন লোক যে জ্ঞান লাভ করে, শিশু অবস্থায় ঝিয়ের কোলে বেড়াইয়া সে তাহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

প্রথমঃ কয়েক বৎসর শিশুর প্রতি অপরিসীম যত্ন করা অত্যন্ত আবশ্যক, কেননা, ঐ সময় অতি অল্প বুদ্ধিকেও বুদ্ধি ও বিবেচনা পূর্ব্বক খাটাইলে অনেক লাভ হয়। কিন্তু ঐ সময় অবহেলা করিয়া বালকের পরজীবনে হাজার যত্ন করিলেও তাহার দশাংশের একাংশও উপকার পাওয়া যায় না। কারণ, তখন অনেক বৎসরের মন্দ অভ্যাস ও অশিক্ষিত অবস্থা মনকে এরূপ দৃঢ় করে যে, উহা শীঘ্র ও সহজে সকল বিষয় ধরিতে পারে না। প্রথম, নীতি বিষয়ে ভাবিয়া দেখ। পূর্ণ বয়সে মহৎ ধর্ম্মের ও সচ্চরিত্রের কত উদাহরণ আমাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু একটা চলন্ত ধুমকেতু যেমন পৃথিবীর কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ ঐ সকল মহৎ দৃষ্টান্তও প্রাপ্তবয়স্কদিগের জীবনে কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। বাল্যকালের স্নেহ, দয়া, আদর, শাসন বা অবিচার, যে কোন বিষয় শিশুর মনে প্রথম অঙ্কিত হয়, তাহা তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনকে চালাইয়া থাকে। খ্রীষ্টধর্ম্ম-মতে আদমের প্রথমঃ পাপ যেমন সমস্ত পৃথিবীকে পাপময় করিয়াছে, সেইরূপ শিশুকালের ভালমন্দ শিক্ষা মানুষের ভাগ্য স্থির করে। মানুষের মধ্য হইতে স্বর্গীয় পদার্থ শিশুর জন্ম। যে অন্তরাত্মা মানুষকে সকল বিষয়ে দায়ী করে, তাহাতে স্বর্গীয় আত্মা বাস করে, আর যে জীবাত্মা

নিজের পরীক্ষার সময় কেবল পাপ কর্ম্ম দেখিতে পায়, তার দুর্গতির ও যন্ত্রণার শেষ নাই। এ পর্য্যন্ত মানুষের ঐ সংশয়-কাল ও উহার ফলের প্রতি কেহই মনোযোগী হয় নাই। কিন্তু এমন কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা কোন কোন সময়ে জীবনের জ্ঞান ও দায়িত্ব স্মরণ করিয়া তাহাতে বিধাতার মহিমা দেখিয়া বিস্মিত হন। মানুষের প্রাণ, বিশেষতঃ, নৈতিক জীবন, প্রথমে উড়ে, তার পর চলে, অবশেষে বিশ্রাম করে। প্রত্যেক গতিশীল বৎসরের সঙ্গে মানব-স্বভাব অধিকতর কঠিন হইয়া আসে। সেই জন্য একজন শিক্ষক কোন দুষ্ট যুবক অপেক্ষা দুষ্ট বালককে বেশী শীঘ্র শুধ্রাইতে পারেন। প্রথম দৃষ্ট দ্রব্যের বা শ্রুত কথার ধারণা বালকের মনে অনেক দিন থাকে, প্রথম-দৃষ্ট উজ্জ্বল বর্ণ, প্রথম-শ্রুত বাদ্য, প্রথম ফুলের রং বা প্রথম কঠোর স্বর শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের সকল কাজে প্রতিফলিত হয়। সেই কারণে কোমল বয়সে শিশুকে ঐ সকল কঠোর স্বর বা অতিরিক্ত বর্ণের ধারণা হইতে দূরে রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা উহার কোমল, অস্ফুট ও চঞ্চল স্বভাব কোনরূপ মিথ্যা জ্ঞান বা মন্দ ধারণার দ্বারা নষ্ট ও বিকৃত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

প্রকৃত শিক্ষার ফল কখন একেবারে সংগ্রহ করা যায় না। আমরা যতই শিশুদের শিক্ষা দিই, ততই অনেক বিষয় অবশিষ্ট থাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। কিন্তু অনেক বৎসরের পর আমাদের পরিশ্রমের ফল দেখা যায়। যেমন বীজ পুতিলে প্রথমে তাহার খোলা ভাঙ্গিয়া অঙ্কুর গজায়, তাহার পর চারা মাথা তুলিয়া ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, অবশেষে যথা-সময়ে ফল ধরে। যদি এই সকল বাক্যে কাহারও সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তিনি সতর্ক ভাবে কিছু দিন বালকবালিকা-দিগের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। পাঠকপাঠিকাগণ, আপনারা প্রথমে নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন, পরে দেখিতে পাইবেন, আপনাদের সন্তানদের যত দোষ গুণ তাহার অধি-কাংশই আপনাদের নিজ নিজ চরিত্রের প্রতিবিম্বমাত্র। দেখিবেন, আপনাদের পুত্রের একগুঁয়ে স্বভাব আপনাদের অতিরিক্ত শাসন দ্বারা ঘটিয়া থাকে, তার অবাধ্যতা আপনাদের অস্থির মতের স্বাভাবিক ফল, আপনাদের নিজের স্বার্থ-পরতা দেখিয়া সে স্বার্থপর হইতে শিখে, আর তার গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা সে আপনাদের মুখ হইতে শুনিয়া শিখিয়াছে, না হইলে ঐ সরল, নির্ম্মল শিশুর মন কি প্রকারে ঐরূপ দুষ্ট ও কর্কশ হইবে। নিশ্চয় জানিবেন, নূতন চক্‌-চকে কাঁসার বা পিতলের বাসনে তৈল না লাগিলে কখন কলঙ্ক ধরে না। আপনারা ইহাও নিশ্চয় জানিবেন যে, বালক বালিকার পর জীবনের দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা শিশু-কালের মিথ্যা ভয় ও অন্যায় শাসন হইতেই জন্মিয়া থাকে। আপনারা আপাত-শান্তির

আশায় যে সব নানাপ্রকার বীভৎস আকার ও ভয়ঙ্কর শব্দের দ্বারা শিশুদের রোদন থামাইবার চেষ্টা করেন, তাহা ঐ কোমল মনে প্রবেশ করিয়া চিরজীবনের মত উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। সদ্যো-জাত শিশুর আত্মার অজ্ঞতা, কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা ও সকল বিষয়ে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করা হইতে নিরন্তর শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে যে কত অসংখ্য ভ্রম ও অপকার ঘটিয়া থাকে, তাহা বর্ণনাতীত।

এখন ঐ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতির উপায় সকল পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। শিশুদিগের হিতৈষী বন্ধু অনেক মহাত্মা শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়া তাহা-দের উন্নতিসাধনের উপযুক্ত পুস্তক সকল লিখিয়াছেন, ও অনেক উপদেশ দিয়া-ছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত জর্ম্মণপণ্ডিত ফ্রোবেল ও পেষ্টেলজি শিশুস্বভাবের গভীর তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন। দার্শনিক জিয়ান পল দৈব-বাণী স্বরূপ বলিয়াছেন,—"কিরূপে শিশু-চরিত্র গঠন করা যাইতে পারে ও কিরূপ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া উহা প্রস্তুত করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহে আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে হাজার বই লিখিলে বা পড়িলে তাহা কোন কাজে আসিবে না, কারণ ঐ সকল পুস্তকের এমন সকল অসামান্য গুণ ও উপায় থাকা উচিত যাহা দ্বারা অস্ফুটন্ত শিশুস্বভাবের সকল দিক প্রকৃতরূপে বুঝাইয়া দিবে। শিশুতে আমারাত পূর্ণবয়স্ক মানুষ দেখি না, কেবল উহার ছায়া মাত্র দেখি। সেইজন্য যাঁহারা পদার্থতত্ত্ববিৎ নহেন, তাঁহাদের নিকট আস্র্ণার মধ্যে প্রজাপতির রং আবিষ্কার করা যেমন কঠিন, সাধারণ লোকের পক্ষে শিশুর স্বভাব উত্তমরূপে বুঝাও তেমনি দুষ্কর"।

জর্ম্মণ দার্শনিক ফ্রেডরিক ফ্রোবেল শিশুদিগের ঐ গুপ্ত স্বভাবের প্রথম আবি-ষ্কারক। পিতা মাতা ও শিক্ষকের নিকট যে স্বভাব সমস্যার স্বরূপ ছিল, ফ্রোবেল সর্ব্বপ্রথমে তাহার দ্বার উন্মুক্ত করেন। প্রাচীন কালের গণকেরা যেমন পাখীর গানের দ্বারা ভাল মন্দ ঘটনার নির্ণয় করিত, সেইরূপ ফ্রোবেল নূতন শিশুর ফুটন্ত স্বভাবে তাহার শক্তি ও বুদ্ধির পরিমাণ জানিয়া ঐ প্রশস্ত ও বিশুদ্ধ অবস্থাতেই উহা ভালরূপে বুঝিয়া তাহার পুষ্টিসাধনের উপায় দেখিতে পান। বালকবালিকাদিগের ঐ প্রথম মহা-শিক্ষক ফ্রোবেল শিশুদিগকে উন্নত ও মার্জ্জিত শিক্ষা দিয়া বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত করিবার প্রণালী স্থির করেন। তিনি তাঁহার "কিণ্ডার গার্টেন" নামক শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা নিজের নাম ইউ-রোপের সর্ব্বত্র ও আমেরিকায় পর্য্যন্ত সুপরিচিত করিয়াছেন। শিশুকলিগুলি, বাগানের যত্নপ্রাপ্ত সুপুষ্ট ফুলের ন্যায়, ঐ নূতন শিক্ষার প্রভাবে নানা গুণ ও জ্ঞানে পূর্ণ হইয়া সমুন্নত মনুষ্য-পুষ্পে বিকশিত হয় ও নিজেদের আনন্দ ও উজ্জ্বলতার দ্বারা দর্শকদিগের মনোরঞ্জন করে। ঐ

কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষা প্রণালী যে কত উপকারী এবং শিশুদিগের মনের ও শরীরের কত পুষ্ট সাধন করে, তাহা আমরা ক্রমে দেখাইবার চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসী।

---

# আদি ও অন্ত।

সৃষ্টির সকল বস্তরই উৎপত্তি ও লয় দেখিতে পাওয়া যায়। চিরস্থায়ী অবিনাশী কোন বস্ত বা প্রাণী এ পর্য্যন্ত মানবদৃষ্টিতে পতিত হয় নাই। এই উৎপত্তি ও নাশের কত রূপ আছে, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবজাতির জন্ম ও মৃত্যু এ জগতের প্রধান অভিনয়, ইহাতেই সকল জ্ঞান বিজ্ঞান নিহিত রহিয়াছে। সকল শিক্ষা ও সাধনা মনুষ্যজীবনের এই দুই পথ দিয়া লাভ করা যায়। ভাবিয়া দেখিলে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুই সুগম জ্ঞান হয়। অদ্য জনৈক কবির মতে মৃত্যুর রূপ বর্ণনা করিব।

এই বিশাল বিশ্বের অধীনতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত জগদীশ্বর "মৃত্যু" নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ইহাতে কালের বৃথা অভিমান স্থিরীকৃত হইয়াছে। উহাতে সারাংশ কিছুই নাই। কেবল "নাশ" মাত্র। বাস্তব বর্ণনায় ইহা স্বভাব ব্যতীত একটি নাম মাত্র।

মৃত্যুকে কেবল চিত্রে দেখা যায়, গল্পে শুনা যায় ও ইহা হৃদয়ে এক প্রকার আশঙ্কা জন্মায়। আর ইহার অনুভূতি তীক্ষ্ণ কণ্টকের ন্যায় চিত্তে বিদ্ধ হয়। দুষ্টাত্মাগণের নিকট ইহা অতি ভীষণরূপী ও নির্ব্বোধদিগের নিকট ভীতিপ্রদর্শক। ইহা জ্ঞানীর পক্ষে শান্তির পথ ও পুণ্যাত্মার জীবনের মুক্তির দ্বারস্বরূপ। এই মৃত্যু ব্যথার উপশম, দুঃখের অবসান, বন্দীর স্বাধীনতা ও বিশ্বাসীর আনন্দ। মৃত্যু পাপীদিগের দণ্ড স্বরূপ ও অধার্ম্মিকদিগের শঙ্কা ও শাস্তি। ইহা ঘাতকের কর স্বরূপ। ইহা ধনীর পক্ষে বিলাপসঙ্গীত, শোকার্ত্তের সুখসোপান। মৃত্যুর কাল অনির্দ্ধারিত ও গতি অনিবার্য্য। মৃত্যু তাপিত ও ক্লান্ত জীবনের প্রিয় অর্ভ্যর্থিত বন্ধু। ইহা অসাধ্য রোগে সুচিকিৎসকের কার্য্য করে। ইহা স্বর্গের দুন্দুভি, ও মর্ত্ত্যের ভাণ্ডারী। ব্যাধির পশ্চাদ্‌গামী ও নরকের পূর্ব্ব সমাচারদাতা।

ইহার ভাবনায় কোন প্রকার সুখ নাই, ইহা সর্ব্বত্র অজেয়। ইহা পাপীর হৃদয়ের শল্য, দুর্ব্বলের আতঙ্ক, ধার্ম্মিকের মুকুট ও প্রীতিলাভের সোপান এবং প্রেতের পক্ষে চাতুরী স্বরূপ।

আমরা মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে কোন মতেই উদ্ধার পাইতে পারি না। কেহ বা আনন্দের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছেন, কেহ বা শত যাতনায় পীড়িত

হইয়া অপরাধীর বধ্যভূমি-গমনের ন্যায় ইহার দিকে যাইতেছে।

যখন মৃত্যু আসিয়া এই সংসারের প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেয়, তখন মনুষ্যের শোক-তমসায় সম্পূর্ণরূপে বিবেক-দৃষ্টি লোপ পাইয়া যায়। সমগ্র জীবনের সংসার-সুখ ও আরামের বিঘ্নসাধকের প্রতি কি যে বীতরাগ আসিয়া পরিবেষ্টন করে, তাহার বিচার তৎকালে অসাধ্য। কিন্তু প্রবল প্রতাপের প্রভাবে এ নশ্বর সুখের অতৃপ্তি ও বৈরাগ্য আপনা আপনি প্রাণে আসিয়া পড়ে। মৃত্যুর ন্যায় সন্ন্যাসী আর নাই। ইহা বিলাস, বাসনা, কামনা, সকলেরই বিলোপ সাধনে তৎপর। মৃত্যু যোগী, মৃত্যু তপস্বী, সেইজন্য ইহা সংহার-মূর্ত্তি শিবের অনুচর। মৃত্যুকে না চিনিলে এই পৃথিবীর ভঙ্গপ্রবণ চাকচিক্যময় বস্তু হইতে কি চিত্তের কখন বিকার জন্মিত? এই ধারা প্রবাহিনী তটিনীর স্বচ্ছহিল্লোল, কমনীয় কমলদামের সুসৌরভ, প্রেমের সঙ্গীত, মুরলীর মধুর বাদন, মৃত্যুর দর্পণে সকলই অসার, কিছুরই মুগ্ধকরী শক্তি তথায় বলীয়সী নহে। মৃত্যু নিত্য আসিয়া জগতের গুরুস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া মানবকে পর পারের বার্ত্তা দিতেছে ও পাথেয় সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইবার আদেশ করিতেছে। আমরা সকলেই সেই পথের যাত্রী, কেবল অগ্র পশ্চাতের বিভিন্নতা, সেইজন্য আমাদের এত বিষাদ ও এত অশান্তি। যিনি মৃত্যুর আজ্ঞাবাহিনী হইয়া তদীয় রাজ্যে প্রবেশ করেন, তাঁহারই শান্তি ও আরাম। আর যিনি রহিলেন, তাঁহার প্রাণে মৃত্যু কেবল সেই বিদায়চিত্র ও তদীয় অভিনয়ের স্মৃতির ছাপ মারিয়া চলিয়া যায়। তাই হে মৃত্যু! তুমি সংসারে সর্ব্বজয়ী, তোমাকে নমস্কার।

শ্রীমনোজবা-রচয়িত্রী।

---

# প্রায়শ্চিত্ত।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

রাত্রিতে জ্বর বাড়িল। সমস্ত রাত্রি নীরজা মোহিতের শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। প্রভাতে ডাক্তার আসিয়া বলিল "পূর্ব্বে কি আপনার মধ্যে মধ্যে জ্বর হ'ত?" মোহিত ভাবিয়া বলিল "মাস আট নয়ের মধ্যে চারি পাঁচ বার জ্বর হ'য়েছে"। "বুকে বেদনা আছে?" "অল্প অল্প"। ডাক্তার একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন "আপনার একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। যাক্ কোনো চিন্তা নাই, ঔষধ দিয়ে যাচ্ছি, জ্বর দুই এক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে।"

দুই এক দিন হইয়া গেল, ক্রমে সাত আট দিন হইয়া গেল, তথাপি জ্বর সারিল

না। জ্বর ছাড়ে, আবার আসে। উত্তাপ প্রায় একশ চার হয়। নীরজা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিন রাত্রি মোহিতের মাথার কাছে বসিয়া থাকে। তাহার মলিন মুখ দেখিয়া মোহিত বলিল "নিরো ভাব কেন, জ্বর হয়েছে এতে আর বেশী ভাবনার কথা কি?" নীরজাও তাই বুঝিতে চেষ্টা করিত, সে স্বামীকে প্রফুল্ল করিবার জন্য ও নিজে অন্যমনা হইবার জন্য কত পুস্তক পড়িত, সংবাদপত্র পড়িত, কত গল্প করিত। পনের দিন কাটিয়া গেল, তথাপি জ্বর বন্ধ হইল না। নীরজা বলিল "এ ডাক্তার ভাল নয়।" অন্য ডাক্তার আসিল। সাত আট দিনে সেও কিছু করিতে পারিল না। তখন সাহেব ডাক্তার আসিল। এক মাস কয়েক দিন পরে মোহিতের জ্বর ছাড়িল। লীলা পিতার শয্যা পার্শ্ব ছাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। নীরজার ম্লান পাণ্ডু মুখে ক্রমে রক্তের সঞ্চার হইল। মোহিত ক্রমে পথ্য পাইল। পথ্য করিবার পর দিন মোহিত চেয়ারে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিল। লীলা তাহার চিক্কণ কেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে আসিয়া বলিল "বাবা এই পত্রখানা পিয়ন দিয়া তোমাকে দিতে বলে গেল।" মোহিত লীলার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল "লীলা তুই পত্রখানা পড়ে আমায় শোনাতে পারবি না?" লীলা একটু ভাবিয়া বলিল "বল হলে পলে পাল্‌ব"। মোহিত তাহাকে চুম্বন করিতে গেলে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। নীরজা আসিয়া বলিল "কার পত্র?"

"এখনো পড়িনি।" মোহিত খুলিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল। নীরজা দেখিল মোহিতের হস্তকাঁপিয়া পত্রখানি পড়িয়া গেল। বিস্মিত হইয়া নীরজা পত্রখানা তুলিয়া পড়িল, কাশী হইতে কেহ লিখিয়াছে যে, নন্দবাবু কল্য রাত্রিতে কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সহসা নীরজা চাহিয়া দেখিল, মোহিত ক্রমশঃ এলাইয়া আসিতেছে, সভয়ে নীরজা মোহিতকে ধরিয়া ফেলিল। শয্যায় শোয়াইয়া পাখা আনিবার জন্য ছুটিয়া যাইতে নীরজা চেয়ারে পা বাধিয়া পড়িয়া গেল। মস্তকে বিষম আঘাত লাগিল, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সে উঠিয়া পাখা লইয়া ছুটিয়া আসিয়া মোহিতের মস্তকে ও চক্ষে বারি সিঞ্চন করিয়া বাতাস করিতে লাগিল। দাস দাসীরাও আসিয়া জুটিল। নীরজা তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তথাপি প্রাণপণে বলসঞ্চয় করিয়া মোহিতের শুশ্রূষা করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মোহিত চক্ষু মেলিল, ভগ্ন কণ্ঠে ডাকিল "বাবা"! সে স্বরে নীরজা কাঁদিয়া ফেলিল। মোহিত নীরজার দিকে চাহিল, ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিয়া বলিল "নীরো, বাবা আমার উপর রাগ করিয়াই চলে গেলেন, ক্ষমা চাইতেও সময় পেলাম না।" নীরজা কাঁদিতে কাঁদিতে মোহিতের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিতে লাগিল।

সমস্ত দিনটা নীরজা সেইখানে বসিয়া কাটাইল। মোহিত একবার মাত্র বলিয়াছিল "আমাকে যে স্নান করতে হবে, কাছা পরতে হবে, না না, আমার বুঝি তাতেও অধিকার নাই। আমি যে বাবার ত্যজ্য। সতীশ! সতীশই তাঁর ছেলে, সে সুপুত্র, সেই সব করবে।" নীরজা নীরবে চক্ষুর জল মুছিল। বহুক্ষণ পরে অন্যমনস্কভাবে বুকে হাত দিয়া মোহিত বলিল—"নিরো, বড় কষ্ট হচ্চে! বুকটা বড় ব্যথা করছে"। সভয়ে নীরজা তাহার বক্ষে হাত দিল, তখনি ডাক্তার সাহেবকে ডাকিতে পাঠান হইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া চিন্তিত হইল, ঔষধ দিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে নীরজা মোহিতের কপাল ও হৃদয় স্পর্শ করিয়া দেখিল অতিশয় উত্তপ্ত। মোহিতের অত্যন্ত জ্বর আসিয়াছে।

দুই তিন জন করিয়া ডাক্তার দেখিতে লাগিল। এক মাসের পর একজ্বরীর বিরাম হইল, কিন্তু রোগের বিরাম হইল না। প্রত্যহ একশ তিন চার ডিগ্রী করিয়া জ্বর হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বুকে ব্যথা ও কাশী। নীরজা চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কোনও কাজে তাহার হাত পা উঠে না, রাত্রি জাগিয়া চোখের কোলে কালী পড়িয়াছে, ম্লান মুখখানি শুষ্ক, তথাপি নীরজা সংসারের সমস্ত কাজ ছাড়িয়া মোহিতের পার্শ্বে ছায়াখানির মত বসিয়া থাকে, ঔষধ খাওয়ায়, বাতাস করে, স্বামী নিদ্রিত হইলে নির্নিমেষ নেত্রে তাহার ম্লান মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। সময় সময় অজ্ঞাত ভয়ে চক্ষু দিয়া জল বাহির হইয়া আসে। মোহিত দেখিতে পাইলে তাহার হাত দুখানি ধরিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে "নিরো, কাঁদ কেন? অত ভাবনা কিসের? আমিত ভাল হব, অত ভয় কেন?" নীরজা প্রাণপণ চেষ্টায় চক্ষের জল রোধ করিতে চেষ্টা করে। মোহিত সমস্ত রাত্রি তাহাকে মাথার নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া এক এক বার বলে একটু শোও গিয়া, সমস্ত রাত্রি অমন করে জেগো না।" নীরজা ক্ষীণকণ্ঠে বলে "আমার তো ঘুম পায় না।" মোহিত আদর করিয়া বলে না আসে একটু চেষ্টা করে ঘুমাও, এ সময়ে যদি তোমার অসুখ হয় তো কি বিপদ হবে মনে করে দেখ দেখি।"তখন নীরজা ভূমিতলস্থ শয্যায় গিয়া হতাশভাবে দেহখানি যেন ছাড়িয়া দিয়া শুইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে যেই স্বামীকে দু এক বার পার্শ্ব ফিরিতে দেখে, অমনি গিয়া নিকটে বসে।

এক এক দিন করিয়া কত দিন গত হইয়া গেল, সেই রোগতপ্ত বিছানার পার্শ্বে বসিয়া রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এক একটা দিন কত দীর্ঘ বোধ হইত। এইরূপে ধীরে ধীরে চারি মাস কাটিয়া গেল। মোহিত নীরজার সহিত মৃদুকণ্ঠে কত গল্প করে, হাসিয়া কথা কয়। নীরজা সংবাদপত্র পড়ে, মোহিত শুইয়া শুইয়া শুনে ও শীর্ণ হস্ত দিয়া নীরজার

চিবুক ধরিয়া কত আদর করে। নীলার ম্লান মুখ দেখিয়া, নীরজাকে বলে "তুমি রাত্রি দিন অত বিষণ্ণ থাক বলে নীলাও হাসি ভুলে গেছে। তুমি ওর দিকে একটু মন দাও, একটু প্রফুল্ল রাখ্‌তে চেষ্টা কর, ভাবনায় ওরও অসুখ হবে।" নীলা ছল ছল চোখে যখন বলে "তুমি কবে ভাল হবে বাবা"? তখন মোহিতের চক্ষেও জল আসিয়া পড়ে, স্নেহকণ্ঠে বলে "ঈশ্বর যে দিন ভাল করবেন, সেই দিন ভাল হব মা।" নীলা বলে "আমি তো ভগবান্‌কে তোমাকে ভাল কর্‌তে কত বলি বাবা, তবুও ভগবান্ তোমাকে ভাল করছেন না কেন?" মোহিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে "কি জানি মা।"

ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়া যান, মোহিতও নীরজাকে কত আশ্বাস দেয়, তথাপি নীরজার ভাবনায় শেষ হয় না, চক্ষের জলের শান্তি হয় না। সহসা একদিন মোহিত বলিল "নিরো, ব্যাঙ্কে মোট তিন হাজার টাকা জমা ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সবই আনা হয়েছে, এত খরচ হচ্ছে, আমি এই ছয় মাস ভুগ্‌ছি, আর কত আছে?"

একটু থামিয়া নত মুখে নীরজা বলিল "হাজার খানেক আছে বোধ হয়।" মোহিত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল "তবে এখন অনেক টাকা আছে, ঐ টাকা ফুরুতে ফুরুতে আমিও ভাল হয়ে উঠ্‌ব।"

নীরজা মাথা নাড়িল। সে তিন হাজার টাকার এখন গটা কয়েক টাকা মাত্র বাকী আছে। তারপরে কি করিবে তাহাও সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল। তাহার পিতার দত্ত প্রায় হাজার দুই টাকার কয়েক খানা গহনা আছে, মোহিতের দেওয়াও হাজার খানেক টাকার গহনা আছে। নীরজা নত মুখে বসিয়া ভাবিতেছিল তাহার পরে ইহাতেও যদি ব্যারাম না সারে, তাহা হইলে কি হবে?

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ঔষধের বিরাম নাই, চিকিৎসারও বিরাম নাই, নীরজার যত্নের বিরাম নাই, নীরজার নিদ্রের বিরাম নাই, নীলার ভীত প্রার্থনার বিরাম নাই, তথাপি মোহিত সারিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ডাক্তারেরাও আশ্বাস দিতে ত্রুটি করিতেছেন না, তথাপি এক বৎসরেও মোহিত নীরোগ হইতে পারিল না।

বসন্তকালের অপরাহ্ণ, মুক্ত জানালা দিয়া বড় মধুর বাতাস আসিতেছে, সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিতেছে, মোহিত শুইয়া আছে, নীরজা নিকটে বসিয়া একখানা পুস্তক পড়িতেছে, অদূরে নীলা ঘুমাইয়া আছে। পুস্তক পাঠ শুনিতে শুনিতে সহসা মোহিত বলিল "নীরজা।" নীরজা পুস্তকখানি রাখিয়া বলিল "কি বল্‌ছ?"

"সে হাজার টাকা এত দিন নিশ্চয় ফুরাইয়া গেছে, না?" নীরজা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, নীরবে তেমনি বসিয়া রহিল।

"তবে এখন কি হবে? ডাক্তার বলেছে ভাল হতে এখনও অন্ততঃ তিন চারি মাস

লাগ্‌বে, এতদিন কি ক'রে চল্‌বে? আর তো টাকা নাই।"

নীরজা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে-ছিল। মোহিত একটু থামিয়া বলিল "তোমার গহনাগুলিতে হাজার তিনেক টাকা হবে, নয়?" নীরজা ঘাড় নাড়িল। "তবে এখন তাই সম্বল, দীনেশকে ডাক্‌তে বল ও কয়েকখানা বাক্স্‌করে তাহাকে দাও।"

নীরজা তেমনি বসিয়া রহিল, কিয়ৎ-ক্ষণ পরে সহসা মোহিত বলিল "নীরো, যদি আমি ভাল না হই?" নীরজা সহসা শয্যায় লুটাইয়া পড়িল, আর সে ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। মোহিত কষ্টে বলিল "আর তো কিছু নাই, নীরো গহনা কখানা থাক্‌, আমি ভাল না হলে তুমি কোথায় যাবে? লীলার কি হবে?" নীরজা তেমনি পড়িয়া রহিল। মোহিত তাহার গাত্রে হাত দিয়া বলিল "কেঁদো না, যদির কথা বল্‌ছি।" লীলা উঠিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। সে পিতার নিকটে আসিয়া বসিয়া বলিল "বাবা, গয়না দিয়ে যে টাকা পাওয়া যাবে, তাতে তুমি ভাল হবে। আমার এই চুড়ীগুলো বেশ ভাল, এ গুলোয় মেলা টাকা হবে, নয় মা? সেই টাকায় তুমি ভাল হবে। লীলা চুড়ী খুলিতে গেল; মোহিত তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "লীলা থাম্‌। ভগবান্! আমার অদৃষ্টে এত ছিল?"

নীরজা উঠিয়া বসিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল "তুমি আমাদের সাহস দাও, তুমি কেন কাতর হচ্ছ? তুমি ভাল হয়ে লীলাকে আবার গয়না গড়িয়ে দেবে।"

"নীরো, যদি ভাল না হই?"

নীরজা আবার লুটাইয়া পড়িল। মোহিতও নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল; তারপরে বলিল "তোমার গুলো দাও, লীলার চুড়ী দিও না।

নীরজা কি করিয়া বলিবে যে, সে গুলির শেষ টুক্‌রাও কবে ফুরাইয়া গিয়াছে। অধোমুখে শুধু বসিয়া রহিল। মোহিতের অল্প সন্দেহ হইল, "নীরো, সে গুলি নাই বুঝি?"

নীরজা তথাপি উত্তর দিতে পারিল না। "সে গুলিও গেছে? নীরো, এই জন্যই কি তোমায় বিবাহ করেছিলাম? শেষে রাস্তায় দাঁড় করালাম। হা ঈশ্বর!"

নীরজা শান্ত স্থির নেত্রে স্বর্গের পানে চাহিয়া বলিল "গয়না গেছে তাতে দুঃখ কি? তোমা অপেক্ষা কি গয়নার বেশী প্রয়োজন? টাকা না হলে লোকে বুঝে না, তাই গয়নাগুলি বিক্রী করেছি। এ তুচ্ছ প্রাণটা নিয়ে যদি কেহ তোমায় ভাল করে দিত তো তোমাকে লুকিয়ে এটাও কোন দিন দিয়ে ফেল্‌তাম। তুচ্ছ অলঙ্কার কি প্রাণের চেয়ে বড়, তোমার চেয়ে বড়, তাই তুমি কাতর হচ্ছ?" মোহিত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "তা নয় নীরজা! আমার ভয় হচ্ছে যদি আমি না বাঁচি!"

নীরজা প্রাণপণে বল সঞ্চয় করিয়া স্থির স্বরে বলিল "কেন বাঁচবে না? তুমি ভাল

হবে, যদি না হও, আমার জন্য ভাবছ? তুমি যাবে, হয়ত আমিও না থাকতে পারি। বাকী লীলা?" গলাটা বড় কাঁপ্‌ল, আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া তারপরে বলিল "যার কাছে দিয়ে গেলে আর কোনো ভয় নাই, তাঁহারই চরণে লীলার স্থান হবে। ঈশ্বর লীলাকে রাখ্‌বেন, তুমি আমি ভেবে কি কর্‌ব?"

( ক্রমশঃ )

শ্রীনিরুপমা দেবী।

---

# ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আত্মজীবনী।

## ৫০ বৎসরের সাক্ষ্য দান।

১। ব্রজনাথ বাবুর প্রভাবে ১২ বৎসরে মৎস্য ত্যাগ।

২। শিবকৃষ্ণ বাবুর যোগে তত্ত্ববোধিনী ও রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা পাঠ, বিদ্যা-বিলাসিনী সভা।

৩। শিবকৃষ্ণ বাবু ও হরিদাস বাবুর নিকট হইতে ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা, বিদ্যা বিলাসিনী সভার সাম্বৎসরিক, জাতিচ্যুতির গোলযোগ।

৪। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীনাথ, নবকৃষ্ণ, উমেশ মিত্র ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়া। কালীনাথের সহিত মিলন, সাংবৎসরিক উৎসবে বক্তৃতা, রমেশ বাবুর ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ।

৫। শিবকৃষ্ণ বাবুর সহিত আদি সমাজ দর্শন, বেদান্তবাগীশের পরামর্শ।

আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা, সত্যেন্দ্র বাবুর সহিত আলাপ।

ব্রহ্ম বিদ্যালয় দর্শন, কেশব বাবু ও সত্যেন্দ্র বাবুর তর্ক বিতর্ক শ্রবণ।

৬। প্রসন্ন বিশ্বাস, রাজা সুরতের সহিত উপাসনাদি।

৭। L. M. S. এ ভর্তি হইয়া Entrancs pass.

Missionary Jouhson.

৮। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়া ও দীন মল্লিকের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ, শিক্ষক মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র।

৯। মেডিকাল কলেজে ভরতি হওয়া, ব্রাহ্মসমাজে রীতিমত গমন, সঙ্গত সভার সভ্য হওয়া ও Night Schoolএ পড়ান।

সঙ্গী—কালীনাথ বাবু, গোবিন্দ বাবু, নিবারণ বাবু, ক্ষেত্র বাবু, বসন্ত বাবু, কৃষ্ণধন বাবু, চন্দ্রমোহন বাবু, বিহারী ভাদুড়ী, তারক মৈত্র, R. L. Dutt, বিজয় বাবু, রামপ্রসাদ, মহালানবিশ মহাশয়।

১০। রাজনারায়ণ বাবুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ, ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনীর

সম্মিলন উপলক্ষে মহাসভা। সভাপতি কানাইলাল পাইন, বক্তা রাজনারায়ণ বাবু, সত্যেন্দ্র বাবুকে সমাজের কার্য্যে উৎসর্গ।

১১। মেডিকালকলেজ ছাড়িয়া F. A. পরীক্ষা দিবার চেষ্টা। জয়নগর স্কুলের কার্য্য, কালীনাথের সহিত দেশে কার্য্য, ২২এ চৈত্র মজিলপুর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও তাহার উন্নতি।

দক্ষিণ বারাসত ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন ও ব্রজনাথ বাবুর বক্তৃতা। ব্রাহ্ম মতে কালীনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ। মহর্ষির পিতৃশ্রাদ্ধের পুথি হরনাথ দ্বারা আনীত। দেশে হুলস্থুল, জাতিচ্যুতি।

পিতামহীর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ। জ্যেষ্ঠ ও তাঁহার পত্নীর যোগ দান। দেশে হুল্-স্থুল।

জয়নগর স্কুলের কর্ম্মচ্যুতি। হরনাথের দীক্ষা।

১২। পরশুরামের যোগে Training Academyতে কার্য্য। তথা হইতে হিন্দু স্কুলে।

১৩। বামাবোধিনী পত্রিকা—ব্রাহ্ম আত্মীয় সভা—২য় খণ্ড বাঃ বোঃ পাইয়া কেশব বাবুর উৎসাহ দান। লেখক বিজয় বাবু প্রভৃতি।

১৪। নিবধই গমন, উদয় বাবুর সহিত সমাজের আচার্য্যের কার্য্য, নিবধই স্কুলে মহর্ষির সাহায্য দান। পাকুড়াশীর সহিত মহর্ষির আগমন, বক্তৃতা শ্রবণে আনন্দ, তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা।

১৫। স্বরূপ দত্তের সহিত আলাপ, ষষ্ঠী দত্তের ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ। দত্ত-পুকুরে ব্রহ্মবিদ্যালয়। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ও হরি উপদেশের বিষয়, বিবাহ।

১৬। কালীকৃষ্ণ দত্তের পিতৃশ্রাদ্ধ, গৃহ হইতে ব্রাহ্মসমাজ উদ্যানে প্রেরণ।

এক্ এ পাস।

১৭। ১৮৬৫ সালে রাজপুর স্কুলে আগমন, বিদ্যাভূষণমহাশয় সমাজসংস্কার ও ব্রাহ্মসমাজের পোষক। ভুবন ভট্টাচার্য্যের পৈতা ত্যাগ। হলধর, উমাচরণ, কেদার দে, মহেন্দ্র ঘোষ, সারদা মিত্র প্রভৃতির সহানুভূতি। চিমুকে লইয়া গান ও উপাসনা।

১৮। হরিনাভি স্কুল, তথায় নিয়মিত উপাসনা, জানকী বাবু প্রভৃতির সহানুভূতি। ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল প্রভৃতির আগমনে গোলযোগ।

১৯। কেদার নাথ দেবের সহিত মিলিয়া হরিনাভি সমাজ স্থাপন। প্রতাপ বাবু কর্ত্তৃক সমাজগৃহ উৎসর্গ। অবিনাশ, কালীকৃষ্ণ, চন্দ্র, প্রিয়, কেদার প্রভৃতির উৎসাহ। শনি, রবিবার কলিকাতায় কালীকৃষ্ণ দত্তের বাসায় যাপন।

সিঁদুর গাড়ী।

২০। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, শিবনাথ প্রভৃতির দীক্ষা।

২১। দেশের লোকের কথায় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মনোভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তন। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ উঠাইয়া দিবার জন্য লোকের চেষ্টা। ব্রাহ্মসমাজে যাইবার জন্য বালকদিগের উপর উৎপীড়ন, স্কুলের কার্য্য ত্যাগ।

২২। কলেজ ষ্ট্রীট ৫৪ নং বাটীতে ত্রৈলোক্যের সহিত আগমন। সমাজ সেবার চেষ্টাই ত্যাগের কারণ।

২৩। হরিনাভিতে বিষম পরীক্ষা, তাহার ফল।

২৪। কোন্নগর স্কুলে কার্যালাভ, কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য। শিবচন্দ্র বাবুর সহিত যোগ ও তাঁহার জীবনের আদর্শ ভাব।

২৫। সঙ্গত সভার সম্পাদকের কার্য্য। কেশব বাবুর বিলাত গমন ও প্রত্যাগমন। কলিকাতা হইতে কোন্নগর যাতায়াত।

২৬। ভারতাশ্রমে স্ত্রীর বাস ও তাঁহার কার্য্যপ্রণালী।

২৭। ভারতাশ্রম কলিকাতায় আসিলে তথায় বাস। স্ত্রীর ভূতলে পতন ও গুরুতর আঘাতপ্রাপ্তি, সকলের সহানুভূতি।

২৮। ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেস, ভারত সংস্কারক প্রচার। বামাবোধিনী ও ধর্ম্মসাধন।

২৯। কলিকাতায় থাকিবার চেষ্টা। কলিকাতায় Boy's School স্থাপন। তাহার ও শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের Head Master। (Albert College) স্কুলের স্বত্ব ত্যাগ কলিকাতা ত্যাগের কারণ।

২৯। হরিনাভি হইতে আহ্বান। শিবনাথের হরিনাভি ত্যাগ। হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের পুনরুন্নতি। সূর্য্য বাবুর সহিত যোগ।

৩০। প্রচারকদিগের সহিত পৃথক ভাব। হরনাথের আশ্রম ত্যাগ। প্রভেদের আধিক্য। নগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা। শিবনাথের ক্রমে আকৃষ্ট হওয়া। যদু বাবু, কালীনাথ, কেদার রায় পঞ্চপ্রদীপ। হরনাথের স্কুলে উপাসনা ও মিলন। কেশব বাবুর উভয় দিক রক্ষা।

৩১। কুচবিহার বিবাহ। কেশব বাবুর প্রগল্ভোক্তি।

৩২। টাউন হল সভা ও আনন্দ মোহন বসু।

৩৩। ভারতবর্ষীয় উপাসকমণ্ডলীর বিচ্ছিন্নতা। নূতন উপাসকমণ্ডলী স্থাপন, তাহার আচার্য্যের ভার। ব্রাহ্মসমাজ কমিটি।

৩৪। বেথুন কলেজ ও ছাত্রী সমাজ।

৩৫। সিটী কলেজ স্থাপন—ঐ কলেজে কার্য্যের জন্য হরিনাভি ত্যাগ, প্রেস বিক্রয়। দুর্গামোহন ও আনন্দ মোহন বাবুর বদান্যতা।

৩৬। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির স্থাপনে গোবিন্দ বাবুর সহায়তা।

৩৭। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের দংশন করিয়া আত্মহত্যা ও আত্মচ্ছেদ।

৩৮। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে নূতন উৎসাহ। গোস্বামী, শিবনাথ, রামকুমার বাবু, অগ্নিহোত্রী, আনন্দমোহন ও দুর্গামোহন বাবু, দ্বারিক বাবু (গাঙ্গুলী), মহলানবিশ।

৩৯। ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী, সমাজের পত্রিকা ও নানা কার্য্যবিভাগ, ছাত্রসমাজ, সঙ্গত, উপাসকমণ্ডলী,

উৎসব। ব্রহ্মসঙ্গীত ও অন্যান্য publication.

৪০। সমাজের ক্রমোন্নতি ও অবনতির কারণ।

৪১। যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী হইয়াছে তাহার দোষ গুণ।

৪২। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক শৈথিল্য ও দুর্ব্বলতা।

৪৩। সমাজত্রয়ের মিলন চেষ্টা। রামমোহন রায় উৎসব, মহর্ষির গৃহে মাঘোৎসব। প্রতাপবাবুর চেষ্টা।

৪৪। আত্মীয় সঙ্গত ও উপাসনা।

৪৫। সাধনাশ্রম ও সেবাশ্রম।

৪৬। উষাকীর্ত্তন।

৪৭। সেবকমণ্ডলী।

৪৮। বালিকা বিদ্যালয়।

৪৯। Sunday School.

৫০। উদ্যান সম্মিলনী।

৫১। Unitarianদিগের সহানুভূতি ও সাহায্য।

৫২। Theistic Conference.

৫৩। Miss Collet, Miss Cobbe, Newman, Hamergrain.

৫৪। সিটী কলেজ ও ইহা দ্বারা সমাজের সাহায্য।

৫৫। দুর্ভিক্ষাদিতে ব্রাহ্মসমাজ।

৫৬। ব্রহ্মবিদ্যালয় ও Theological class.

৫৭। জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা উচ্ছেদে অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রচলনে ব্রাহ্মসমাজের সহায়তা।

৫৮। Reform.

৫৯। ব্রাহ্ম দরিদ্র পরিবারের জন্য চেষ্টা।

৬০। বিধবাশ্রম।

৬১। শ্রমজীবী বিদ্যালয়।

৬২। নিম্ন শ্রেণী ও অসভ্যদের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার।

৬৩। সমুদায় ভারতের একীকরণে ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য।

৬৪। বিদেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব।

৬৫। Brahmo Annual Almanac.

৬৬। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ সংখ্যা।

৬৭। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার।

৬৮। ব্রাহ্মসমাজে রামমোহন, দেবেন্দ্র, কেশব, রাজনারায়ণ ও আনন্দমোহন প্রভৃতির স্থান।

৬৯। নববিধান, দেবসমাজ ও গোস্বামী শিষ্য সমাজ।

৭০। Brahmo literature and foreign literature helping the Brahmo samaj.

৭১। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ।

৭২। বৈষ্ণব ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, উপনিষদ, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ ও Theosophyর প্রভাব।

# পত্নী।

নবাগত রাজীব, অনাদি চরণের কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর গাড়ী দস্তুর মত চলিতেছে, অগণ্য পথিক রাজপথ বাহিয়া গম্য স্থানে যাইতেছে। ফেরিওয়ালা "চাই বরফ, কুল্পি বরফ, চাই বেল ফুল" হাঁকিতেছে। সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে—নং মেসে, অনাদি চরণের অঙ্কে রোরুদ্যমান রাজীব রাস্তার দিকে কোন লক্ষ্য করিতেছিল না।

রাজীবের প্রিয়তম শ্রেষ্ঠতম বন্ধুবর কমলাকান্ত সহসা আসিয়া এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। আগ্রহপূর্ণ ও আকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "একি রাজীব, কি হয়েছে ভাই ?"

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের সময় হইতে যাহা হইয়া আসিতেছে, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না, প্রাণ তুল্য বন্ধুর উপস্থিতিতে রাজীবের কান্না আরও বাড়িয়া গেল।

তখন রাজীবের শীঘ্র উত্তর দিবার সম্ভাবনা না দেখিয়া, অনাদি বলিল "বে" করে রাজীবের মনে বড় কষ্ট হয়েছে, বৌকে ওর মোটেই পছন্দ হয় নাই"।

বিস্ময় ও আগ্রহে কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিল "সে কি রাজীব ?"

তখন রাজীব চক্ষু মুছিয়া, ঢোক গিলিয়া প্লুত ও অনুনাসিক স্বরে বন্ধুকে সবিশেষ বুঝাইতে চেষ্টা করিল।

কমলাকান্ত বুঝিতে লাগিল, রাজীবের নববিবাহিতা স্ত্রী পল্লিগ্রামের অনাথা বিধবার কন্যা, কোনও প্রসিদ্ধ লোকের কন্যা নহে—মেয়েটী শ্যামবর্ণা, অতি মৃদুস্বভাবা অর্থাৎ পাড়াগেঁয়ে হাবা মেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সেক্ষপীয়র-পাঠক রাজীবের হৃদয়ে উপন্যাসের নায়িকাদিগের যে রূপগুণ জাগিতেছিল, তাহার পত্নী সে রকমের কিছুই নহে। রাজীবের পিতা হৃদয়হীনের মত, ভদ্র লোকের জাতি রক্ষা করিতে গিয়া, পুত্রের জীবন এইরূপে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন ! নির্ম্মম জাগরণের হাতে পড়িয়া তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙিয়া গিয়াছে ! আরও দুঃখের কথা এই যে, বাড়ীতে অথবা নিজ গ্রামে রাজীব যাহার নিকটেই এই দুঃখের কথা জানাইত, সেই বলিত "তুমি কি পাগল ? অমন মেয়ে কি সর্ব্বদা মিলে? ওটী তো লক্ষ্মী" ইত্যাদি। সহানুভূতি দূরে থাকুক, সকলেই সেই অযোগ্যা পত্নীর পক্ষ সমর্থন করে। সুতরাং এ জগতে রাজীবের কাঁদিবারই কথা, রাজীব চিরদিনই কাঁদিবে !

কমলকান্ত সব বুঝিল। বুঝিয়া

মনে মনে বড়ই খুশী হইল—তা' সে তো রাজীবের প্রাণের বন্ধু, তবে যে কেন খুসী হইল, সে কথা পরে বলিতেছি।

যখন পল্লিগ্রামবাসী রাজীবলোচন এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া, পনর টাকা বৃত্তি, গ্রামব্যাপী গৌরব এবং সাধারণের সশ্রদ্ধ মনোযোগ লইয়া, কলিকাতার কলেজে এফ্. এ পড়িতে প্রবৃত্ত হইল, তখন অনেকে তাহাকে "অসাধারণ" করিয়া তুলিল। মধুলোলুপ ভৃঙ্গের মত তাহার ভালবাসা-প্রয়াসী অনেক ব্যক্তি তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে আসিল। সেই সতর বৎসরবয়স্ক বালক রাজীবের উদ্যমশীলতা, একাগ্রতা, পরার্থপরতা এবং স্বদেশপ্রীতি দর্শনে বন্ধুগণ তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইল। দরিদ্র রাজীবকে কেহ জুলিয়াস্ সিজার, কেহ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, কেহ বা ম্যাট্‌সিনির আসন দিবার কল্পনা করিতে লাগিল।

কমলাকান্ত রাজীবের অন্যতম বন্ধু ছিল, কিন্তু সে ছাড়া রাজীবের আরও বন্ধু থাকিবে, অন্য কেহ রাজীবকে আপনার মনে করিয়া অনেকখানি ভালবাসা দিবে, ইহা তাহার মরণাধিক কষ্টকর হইত। তাই সে রাজীবের সঙ্গে "কায়ার ছায়া" তুল্য হইয়া উঠিল। রাজীব কলেজে যাইবে, তার আগে কমলাকান্ত তাহার পুস্তক, জামা, সমস্তই ঠিক্ করিয়া রাখিত। বৈকালে বেড়াইবার সময় কমলাকান্ত দিক্‌নির্ণয় করিয়া তাহার সঙ্গ লইত। সন্ধ্যার পরে তাহার জন্য ভাল ভাল খাবার আনিয়া দিত। শেলি, রঘুবংশ, মেঘনাদবধ কাব্য প্রভৃতি পুস্তক সুন্দররূপে বাঁধাইয়া "প্রাণাধিক রাজীব গ্রহণ কর" লিখিয়া উপহার দিত। রাজীবের একটুকু অসুখ হইলে কমলাকান্ত নিজে কলেজ কামাই করিয়া তাহার অপ্রত্যাশিত শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইত। রাজীব তাহাকে কলেজে যাইতে বলিলে সে বলিত "তোমাকে অসুস্থ দেখিয়া স্বর্গে গিয়াও আমি শান্তি পাই না, তা কলেজে যাব কিরূপে"। গাভী যেমন তাহার নবজাত বৎসকে সকল জীবের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, কমলাকান্তও সেইরূপ রাজীবকে সকল বন্ধুর ভালবাসার আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। বলা বাহুল্য, এতাধিক ভালবাসায় রাজীবের কোমল হৃদয়ও কমলাকান্তের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। অন্য সকলকে ছাড়িয়া সে কমলাকান্তকেই আত্মসমর্পণ করিল।

( ২ )

এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইলে রাজীব এফ, এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। তখন কমলাকান্তের মনে একটা আশঙ্কার এবং রাজীবের মনে একটা বিরক্তির কারণ উপস্থিত হইল।

সহসা রাজীবের পিতা পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া—শুধু সম্বন্ধ নহে, একেবারে উহা পাকাপাকি করিয়া পুত্রকে বাটী লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

সুতরাং আধুনিক রীত্যনুসারে, যাহার বিবাহ সে নিজে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রী দেখিবে, একজন প্রিয় বন্ধু তাহার সঙ্গে থাকিবে, বেশভূষাপরিশোভিতা এক সুন্দরী নিতান্ত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া তাহাদের সম্মুখীনা হইবে, তাহার প্রথিতযশা পিতা নিতান্ত দীন হীনের মত ভাবী জামাতার দয়া ভিক্ষা করিতে থাকিবে, পুরবাসিনী-গণের সস্পৃহ চক্ষু জানালা ও দরজার আড়াল হইতে বন্ধুযুগলের উপরে পড়িতে থাকিবে ইত্যাদি ইত্যাদি মধুমাখা কবিত্ব ইহাতে কিছুই হইল না, তাই এই শুষ্ক নীরস বিবাহ ব্যাপারটী রাজীবের বড়ই বিরক্তিকর হইল। তবে তাহার তেজস্বী পিতার মতের বিরুদ্ধে সে কোন দিন দাঁড়ায় নাই, এবারেও দাঁড়াইতে সাহসী হইল না। তাহার মনের এই সকল কথা জানিয়াও কমলাকান্তের আশঙ্কা হইতে লাগিল এখন রাজীব যাহাই বলুক, বিবাহ করিয়া তাহার সমস্ত হৃদয়খানি যদি নব বধূকে উৎসর্গ করিয়া দেয়, তাহা হইলে কমলাকান্তের একচেটে ভালবাসার কি দশা হইবে?

তাই নববিবাহিত বন্ধুর পত্নী স্বামীর মোটেই মনোনীতা হয় নাই, বিবাহে রাজীবের কোনও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই, অধিকন্তু তাহার হৃদয়মধ্যে একটা দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, এই কথা বুঝিয়া কমলাকান্ত কৃতার্থ হইল। আনন্দাকুল সন্তুষ্টহৃদয় বন্ধুকে নিজের বাহুযুগল মধ্যে টানিয়া আনিয়া প্রাণভরা সহানুভূতি দিতে লাগিল।

যখন রাজীব বি, এ, পড়িতে প্রবৃত্ত হইল, তখন একদিন তাহার বাড়ী হইতে এই ভয়ানক দুর্ঘটনার সংবাদ আসিল যে তাহার পিতা হঠাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ সংবাদ রাজীবের বজ্রাঘাত তুল্য হইল। তাহার পিতৃশোক তো আছেই, তাহার উপরে অবস্থা সচ্ছল নহে, পিতা অনেক রকম বুদ্ধি বিবেচনা করিয়া সংসার চালাইতেন, রাজীব কি করিয়া সেই গুরুভার বহন করিবে? পড়া শুনার খরচই বা কে দিবে? নিষ্ঠুর অবিবেচক মৃত্যু রাজীব বেচারাকে একেবারে সৌভাগ্যের উচ্চ শিখর হইতে দুর্ভাগ্যের নিম্ন তলে ফেলিয়া দিবার জন্যই তাহার পিতাকে লইয়া গেল! রাজীব এখন কি করিবে?

রাজীবের সমস্ত অবস্থা জানিয়া কমলাকান্ত অনেক সান্ত্বনা, অনেক ভরসা দিল, শেষে বলিল "ভাই বি, এ, পড়াটা ছাড়িও না, প্রাইভেট্ টিউশন পাইবার চেষ্টা কর, আর আমিও যতদূর পারি তোমার সাহায্য করিব"। রাজীব বাষ্পাকুলনেত্রে তাহাকে ধন্যবাদ দিতে উদ্যত হইলে, কমলাকান্ত তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কহিল "আমি কি তোমার পর রাজীব? আমার টাকা, সে তো তোমারি টাকা, আমার এই প্রাণ মন সবই তো তোমারি"। এমন অসময়ে এতখানি সহৃদয়তা পাইয়া রাজীব যেন অকূলে কূল পাইল। শ্রাদ্ধাদি ও বাড়ীর সুব্যবস্থা করিবার জন্য সে পল্লিগ্রামের বাড়ীতে চলিল।

যাইবার সময়ে রাজীব কমলাকান্তকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া গেল "কমল ! এ অভাগাকে ভুল না, আমার তোমা বই আর কেহ নাই।"

এই কথাটী শুনিবার জন্যই কমলাকান্ত এতদিন এত সাধনা করিয়াছে !

কমলাকান্তের আর বেশী দিন পড়িতে হইল না। রাজীব চলিয়া যাইবার কয়েক দিন পরেই, তাহার বিধবা মাতা, নগদ চারি হাজার টাকা এবং এক পরম সুন্দরী কন্যা পাইয়া কমলাকান্তের শুভ পরিণয় সম্পন্ন করিলেন। কমলাকান্ত পড়া ছাড়িয়া সেই টাকা মূলধন করিয়া এক পুস্তকের দোকান খুলিল। অদৃষ্টের জোরে এবং ব্যবসায়ের নিপুণতায় অল্প দিনের মধ্যে সে অনেক অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিল। কলিকাতার উত্তরাংশে মাণিকতলায় তাহার একখানি বাড়ী নির্ম্মিত হইল।

আর হতভাগা রাজীব? বাড়ী গিয়া দেখিল, তাহার বিধবা মাতা, বিধবা পিসী ও তাঁহার দুই অবিবাহিতা কন্যা, বিধবা ভ্রাতৃজায়া ও তাঁহার এক অপোগণ্ড সন্তান, বালিকা পত্নী সবই তাহার পোষ্য। জমা-জমি যাহা আছে তাহা পড়িয়া আছে, বিলি ব্যবস্থা করিবার কেহ নাই। অধিকন্তু রাজীবের পিতা মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে অজন্মা আবাদের খাজনা শোধ করিতে এবং ঘর বাড়ী মেরামত করিতে অনেক টাকা ঋণ করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং এই সকল উপায়হীনাদিগের ভরণ পোষণ এবং ঋণের ভার রাজীবের উপরে চাপিয়া পড়াতে সে মাথায় হাত দিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। তাহার পিতৃশোক, মাতার বৈধব্য, শোকাকুলা আত্মীয়াদিগের করুণ বিলাপ, আর নিজের অসহায় অবস্থা মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে আকুল করিয়া ফেলিল। বি, এ, পড়ার আশাত রহিল না, এই মুহূর্ত্তে বেশী মাহিনার একটি চাকরি জুটিলে সকলে খাইয়া বাঁচে!

দেখিয়া শুনিয়া, গ্রামের লোকের সহায়তায় রাজীব গ্রামের স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইল। সংসার এক রকম চলিতে লাগিল, কিন্তু ঋণশোধের কোন উপায় হইল না। রাজীব কমলাকান্তকে এই সকল কথা সবিশেষ লিখিল।

কমলাকান্ত প্রথমে রাজীবকে সপ্তাহে একখানি, পরে মাসে দুইখানি, শেষে তিন মাস অন্তর একখানি করিয়া পত্র লিখিল। শেষের পত্রে সে স্পষ্ট লিখিয়া দিল আমার অনেক কাজ, পত্র লিখিবার সময় নাই। ইহাতে রাজীবের বুকে বড় ব্যথা লাগিল।

কিন্তু রাজীব স্বপ্নেও বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহার প্রাণের কমল তাহাকে ভুলিয়াছে। কমলের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে জানিয়া রাজীব বড়ই আনন্দ লাভ করিল। মনে মনে স্থির করিল, কমলের নিকট হইতে টাকা লইয়া ঋণ পরিশোধ করিব। শেষে প্রাণপণে কমলের টাকা শোধ দিব। কমল অবশ্য টাকা ফিরিয়া লইতে চাহিবে না—কিন্তু আমি যেমন করিয়া হউক তাহার টাকা

তাহাকে ফিরাইয়া দিব। আপাততঃ তাহার নিকট হইতে টাকা লইয়া সুদের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ তো করি। আর কমলের সহিত অনেক বড়লোকের বন্ধুত্ব হইয়াছে, হয় তো সে আমাকে বেশী মাহিনার একটি চাকুরী যোগাড় করিয়া দিবে। দূর হউক ছাই, কত দিন তাহাকে দেখি নাই, তাহার মুখখানি দেখিতে পাইলে তো বাঁচি। কমল কখনও বিমুখ হইবে না!

এই সব চিন্তা করিয়া রাজীব অনেক দিন কাটাইল। সে মনের কথা কাহাকেও বলে না, মা, পিসী বোঝেন না বলিয়া তাহার বিশ্বাস, পত্নীকে সে বালিকা বলিয়া—তাহার অযোগ্যা বলিয়া—সে উপেক্ষা করে।

যাহা হউক, অনেক দিন পরে যে দিন রাজীব তাহার চির-শুভাকাঙ্ক্ষী, চির-স্নেহময় প্রাণাধিক সুহৃদ্ কমলাকান্তের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল, সে দিন কমলাকান্তের নবজাত পুত্রের ষষ্ঠীপূজার সমারোহ। কর্ম্মচারী তৈল, মৎস্য, সন্দেশ, দধি, ক্ষীর প্রভৃতি ফর্দ্দে লিখিতেছেন, বন্ধু-বান্ধবগণ নাচ গানের ব্যবস্থা করিতেছেন, কানাই স্যাকরা খোকার গহনার সোণা কষিয়া দর দস্তর করিতেছে। খোকার মার জন্য ঘোষ কোম্পানীর দোকান হইতে সদ্য-আনীত জড়োয়া নেকলেসের ঝলকে অনেকে মুগ্ধ হইতেছে। কমলাকান্ত একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া সমস্ত দেখা শুনা করিতেছেন। এই আনন্দোৎসব-পূর্ণপুরীর মধ্যে রাজীব নিতান্ত দীন হীনের মত সঙ্কুচিতভাবে গিয়া দাঁড়াইল। এই কি সেই কমল!

উৎসব শেষ হইয়া গেলে, যখন কমলাকান্তের প্রশ্নের উত্তরে রাজীব তাহার বর্ত্তমান অবস্থা সমস্ত জানাইল, কমলাকান্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনিলেন। সব শুনিয়া রাজীবের অদৃষ্টকে তিরস্কার করিয়া, তাহার বুদ্ধিকে নিন্দা করিয়া শেষে বলিলেন "তুমি আমার দিকে চাহিয়া দেখ, পুরুষ মানুষ কাহাকে বলে! তুমি কোনও কাজ পার না, কেবল মেয়ে মানুষের মত ঘ্যান ঘ্যান করিতে এসেছ। তোমার মত লোকের যে কি উপায় হইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর।"

রাজীব আর বন্ধুর গৃহে তিলার্দ্ধ দাঁড়াইল না। রাস্তায় গিয়া চক্ষুর জল মুছিল।

রাজীবের পঞ্চদশবর্ষীয়া পত্নী শ্যামা সুন্দরী। যদিও তাহার রঙ্ ফরসা নহে, (উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা) শরীর ক্ষীণ, বিধবা মাতার সন্তান, স্বামীর উপেক্ষিতা, তথাপি তাহার মধ্যে পত্নীর প্রাণ ছিল। স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া কাজ করা, তাঁহার সুখ দুঃখে সহানুভূতি করা, তাঁহার কোনরূপ সহায়তা করিতে পারিলে নিজে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করা, এ সবই সে পারিত।

আজি রাত্রিতে কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত রাজীব নিজের শয়ন ঘরে তাহার মা'কে ডাকিয়া আনিল। তার

পরে সাশ্রুনেত্রে গোপনে গর্ভধারিণীর কাছে কমলাকান্তের সমস্ত কথাই বলিল। মা বিধাতাকে স্মরণ করিয়া, অদৃষ্টের আলোচনা করিয়া বলিলেন "বাবা! পর কি কখনও আপনার হয়?" হায় রে! আজ যদি রমানাথ বাবু তোমার শ্বশুর হইতেন" ইত্যাদি বলিয়া মনের ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অদূরে পালঙ্কের উপর শ্যামা সুন্দরী ঘুমাইতেছিল। মাতা পুত্রের কথা বার্ত্তার মধ্যে তাহার ঘুম ভাঙিয়াছিল। সে নিদ্রিতের মত পড়িয়া থাকিয়া সমস্ত কথা শুনিল।

শুনিয়া শ্যামার আর ঘুম হইল না। শ্যামা বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে দরিদ্রা মাতার কন্যা, সুতরাং তাহাকে অনেক ঘটনার মধ্য দিয়া বৰ্দ্ধিত হইতে হইয়াছে, সেই জন্য তাহার সমবয়স্কা-দিগের অপেক্ষা তাহার বুদ্ধি বিবেচনা অধিকতর বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্যামা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত স্বামীর কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিল।

অতি প্রত্যূষে রাজীব তাহার বাটীর অনতিদূরে নদীর কূলে গিয়া বসিল।

ভৈরবী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। তীরে বাঁশের ঝাড় হেলিতেছে দুলিতেছে, তাল, খেজুর, নারিকেল গাছ সকল খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আম, অশ্বথ, বটের বিপুল দেহে বিহঙ্গরাজি সুমধুর কাকলী করিতেছে। রাজীব সেই জনশূন্য স্থানে বসিয়া জলের দিকে চাহিয়া তাহার প্রতি কমলাকান্তের ব্যবহারের কথা ভাবিতেছিল। হায়! এই কি সেই কমলাকান্ত?

শ্যামা পল্লিগ্রামের গৃহস্থ ঘরের বধূ। সে ঘড়া লইয়া সেই ঘাটে জল লইতে আসিল। তাহার মাথায় ঘোম্‌টা, পরণে লাল পেড়ে শাড়ী, মুখে প্রফুল্লতা। পূর্ব্বাশার আলোক তাহার সুন্দর মুখ-খানির উপরে পড়িয়া উহা রঞ্জিত করিয়া-ছিল। রাজীব অন্যমনে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিল। শ্যামা কি সুন্দরী নয়? রাজীব সুন্দরী দেখিয়াছে বটে, কিন্তু এমন সুশ্যামা, পুষ্পলতিকা-তুল্যা, এমন সুগঠনা, এমন হরিণাক্ষী, এমন সর্ব্বাঙ্গশোভনীয়া লক্ষ্মী-প্রতিমা তো রাজীব আর কোথাও দেখে নাই। এই শ্যামাকে বিবাহ করিয়া কিনা সে আপনাকে "হতভাগা" ভাবিয়াছিল, এই শ্যামাকে সে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারে নাই?

বন্ধুর নৃশংসতা, দরিদ্রতার ক্লেশ, ঋণের দারুণ চিন্তা, সেই মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া, অনুতপ্ত রাজীব শ্যামার খুব কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বড় আদর করিয়া তাহাকে বলিল, "এত ভোরে ঘাটে এলে কেন শ্যাম?"

সকালবেলায়, নদীর ঘাটে স্বামীকে এত কাছে দাড়াইতে দেখিয়া শ্যামা বড় লজ্জিতা হইতেছিল, কিন্তু "শ্যাম" শুনিয়া তাহার বড় হাসি আসিল। শ্যামা হাসিয়া কুটি কুটি হইল।

রাজীব অপ্রতিভ হইল না। সেই সরলতা-মাখা হাসি দেখিয়া তাহার আরো বেশী আদর করিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু নদীর ঘাটে আর বেশী চলে না, মুগ্ধ-নেত্রে রাজীব দাঁড়াইয়া রহিল।

হাসি সংযত করিয়া শ্যামা ঘড়া ভরিয়া কাঁকে তুলিল। শেষে চারি দিকে চাহিয়া, মৃদুস্বরে স্বামীকে বলিল "তোমার সঙ্গে আমার একটা বড় কথা আছে, তুমি বাড়ী চল।"

প্রায় তিন বৎসর ইহাদের বিবাহ হইয়াছে, রাজীব ইহার মধ্যে কোন দিন শ্যামাকে এমন চক্ষে দেখে নাই, শ্যামাও কোন দিন তাহাকে এমন করিয়া ডাকে নাই, বিস্মিতচিত্তে রাজীব বাড়ী গেল।

স্বামীকে নির্জ্জনে পাইয়া শ্যামা কতক সঙ্কোচে, কতক আনন্দে, তাহার দরিদ্র মাতার প্রদত্ত যৌতুক সতরটী টাকা এবং এক যোড়া অনন্ত স্বামীর হাতে দিল, তারপরে মৃদু স্বরে বলিল, "ইহা দিয়া তুমি কৃষি কাজ কর, তোমার সব অভাব ঘুচিবে। আমার মা বলিয়া থাকেন, মা বঙ্গভূমির কাছে ভিক্ষা করিলে তিনি সোণা ভিক্ষা দিয়া থাকেন"। মনের আবেগে কথাগুলি বলিয়া শ্যামা অপ্রতিভ হইল।

বিস্মিত বিমুগ্ধ নেত্রে রাজীব সেই বালিকা পত্নীর মুখ পানে চাহিল। নিজের প্রতি ধিক্কারে এবং অভাবনীয় আনন্দে তাহার হৃদয়ে তুফান উঠিতে-লাগিল। চক্ষে জল আসিয়াছিল, কিন্তু লজ্জায় তাহা সম্বরণ করিল। শেষে সে শ্যামাকে বলিল "তুমিই আমার লক্ষ্মী, তুমিই আমার বন্ধু!"

কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্যামার কথা সফল হইল। সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, মা, তাঁহার ভিক্ষুক সন্তানকে পুঞ্জীকৃত সুবর্ণরাশি ভিক্ষা দান করিলেন। রাজীবের বাড়ীতে গোলা-ভরা ধান, গোহাল-ভরা গরু, এবং প্রাণভরা আনন্দ হইল। রাজীব পিতৃকৃত সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিল।

সন্ধ্যার পরে শিশুর জননী শ্যামা সুন্দরীর হাত ধরিয়া রাজীব যখন বলিল "অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা," তখন হাসিয়া শ্যামা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "ও সব মন্ত্র টন্ত্র রাখ, ঐ দেখ মা আসিতেছেন"।

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, এখন রাজীব বন্ধু কমলাকান্তের অনেক উপরে তাহার পত্নীর আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

লেখিকা

শ্রী মা—

# স্বর্গীয় মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী।

আজ তুমি কোন্ খানে, কোন পুণ্য শান্তিময় লোকে—
হে সাধকবর!—
বিরাজিছ স্নিগ্ধ শান্ত চিরোজ্জ্বল নির্ম্মল আলোকে
দীপ্তকলেবর।
সেথা কি শুনিছ নিত্য মনোহর মন্দাকিনীগীতি,
শ্রবণরঞ্জন?
নন্দনের গন্ধবহ মন্দ বায়ে উথলিছে নিতি
প্রীতিপ্রস্রবণ?
সেথা কি সকলি চারু নিত্য নব সুষমারঞ্জিত?—
হে চিরনন্দন!—
ধ্বনিছে কি অবিরত কলরব সুখহাস্যোত্থিত?
নাহিক ক্রন্দন?
শষ্পশিরে হিমকণা প্রভাতের অরুণকিরণে
হয় কি বিলীন?
গগনের জ্যোতিবিন্দু লুকায় কি উষা-সমীরণে
বিষাদমলিন?
হেথায় কুসুমরাজি ঝ'রে যায় অর্দ্ধবিকশিত,—
হে ফুল্লবিকাশ!—
জীবনপয়োধি নিত্য আলোড়িছে ভীম উচ্ছ্বসিত
ও রঙ্গবিলাস।
চঞ্চল সুখের রেখা মাঝে মাঝে আসে পথহারা
অতিথির বেশে,
বসন্তের শান্ত শোভা ঢালে প্রাণে অমৃতের ধারা
শুধু বর্ষশেষে।
তুমি ত্যজিয়াছ দেহ, দ্বাদশ বরষ তার পরে,—
হে বিনাশাতীত! —
কুজ্ঝটিকাসমাচ্ছন্ন অতীতের অনন্ত গহ্বরে
হ'য়েছে সঞ্চিত।

কিন্তু তুমি রে'খে গে'ছ যে আদর্শ উদার মহান্
এ পৃথিবীতলে,
র'বে তাহা সমভাবে নির্ব্বিকার চির দীপ্তিমান্
তব পুণ্যফলে।
শুভ্রচারী পুণ্যদেহ পথভ্রষ্ট দেবদূত সম—
হে নাকনিবাসী!—
পাপময় ধরাপরে এসেছিলে তুমি অনুপম
মাধুরী বিকাশি।
তব অভিরাম তনু যে দেখেছে যে শুনেছে বাণী
উপদেশময়ী,
পুজিয়াছে ভক্তিভরে সেই তব চারুমূর্ত্তিখানি
শোকতাপজয়ী।
তোমার মানসশক্তি অবিচল হিমাদ্রির মত—
হে মনস্বী বীর!—
কাঁপেনি টলেনি কভু শোকতাপ ঝঞ্ঝাবাতাহত,—
নির্ভীক সুস্থির।
লাঞ্ছনার শক্তিশেল, মর্ম্মদহী তীব্র গঞ্জনার
সায়কনিচয়,
ফিরিয়া এসেছে ব্যর্থ, পারে নাই করিতে তোমার
হৃদি দুর্গ জয়।
উপাখ্যান সম তব লোকাতীত সহিষ্ণুতা গাথা—
হে মহিমাময়!—
জাগায়, বিমুগ্ধ স্তব্ধ হৃদিমাঝে সমস্থত্রে গাঁথা
ভক্তিবিস্ময়।
আকুল ক্রন্দন মাঝে গতজীব প্রিয় পুত্র যার
ভূতলশয়নে,
ঢালে সে অন্যের কর্ণে উপদেশবাণী সুধাসার
নিরশ্রু নয়নে!!
ধন্য তব ঈশপ্রেম, যার শুভ্রজ্যোতিবিনিঃসৃত—
হে ভক্তপ্রধান!—
দেখাইত নিত্য তোমা কর্ত্তব্যের পন্থা সুবিস্তৃত

চির-গরীয়ান্।

বিপদের গাঢ় তমঃ আবরিছে চারিধারে যবে
ঘোর ভয়াবহ,
হৃদয়মন্দির তব তবু বিভুগুণ গানোৎসবে
মগ্ন অহরহ।
সত্যের অক্ষয় ভাতি যার মাঝে উঠিয়াছে ফুটি—
হে সত্যশরণ!—
লঙ্ঘি শত অন্তরায় তার (ই) পানে গে'ছ তুমি ছুটি
করিতে বরণ।
অবজ্ঞার ব্যঙ্গহাসি, ভ্রান্তিময় রূঢ় কলরব
তৃণসম গণি,
ঊর্দ্ধবদ্ধদৃষ্টি তুমি, নি'য়ে গেছ স্থিরগতি তব
জীবন তরণী।
পুরাতন ধর্ম্মমূলে স্বতঃজন্মা আবর্জ্জনারাশি—
হে লোকশিক্ষক!
ম্লান করে বিটপীর আদি সত্য তেজ অবিনাশী
দিগন্তব্যাপক।
তাই আসে মাঝে মাঝে ধরাধামে ধাতার আদেশে
মনীষিনিচয়।
স্বর্গ হ'তে এসেছিলে সেইরূপ শিক্ষকের বেশে
তুমিও নিশ্চয়।
সৌজন্যের প্রতিমূর্ত্তি! নম্রতার সজীব প্রতিমা!
হে উদারপ্রাণ!
অস্ফুট কমল যথা ঢেকে রাখে নিজ মাধুরিমা
পত্রাগশয়ান,
শালীনতা ঘনচ্ছায়ে তেমতি গরিমা লেখা তব
ছিল আচ্ছাদিত।
তবু বঙ্গদেশময় তব পুণ্য যশোগীতিরব
আজিও ধ্বনিত।
হেথায় মালঞ্চে তব নাহি আর সে পূর্ব্ব সুষমা,
হে উদ্যানপতি!

তোমার সে নবোদগতা কমনীয়া লতা প্রিয়তমা
মধুরমূরতি।
একটী মুকুল রাখি শুকাইয়া গে'ছে নিরদয়
কাল বজ্রপাতে,
তাই আজি ম্রিয়মাণ সকলি বিষাদছায়াময়,
প্রচণ্ড আঘাতে।
স্বর্গ সিংহাসন হ'তে একবার এস অবতরি,—
হে মুক্ত অমর!—
অলক্ষ্যে হৃদয়ে নব সঞ্জীবনী শকতি বিতরি—
অমিয়নির্ঝর—
আবার ফুটাও হাসি, পূর্ব্বাশার উষারাগ সম
নিশা অবসানে।
শিখাও সে প্রাণোৎসর্গ, দেয় যাহা শান্তি মনোরম
শোকদগ্ধ প্রাণে।
"কীর্ত্তিমান্ চিরজীবী"—সার্থক এ সারগর্ভ বাণী,
হে কীর্ত্তিভূষণ!
অমর সে, মানবের ভক্তিবারি বিধৌত পরাণি
যাহার আসন।
হে দেব! তোমার কাছে যুক্তকরে উচ্ছ্বসিত মনে
এ আশীষ মাগি।
তোমারি পদাঙ্ক যেন অনুসরি জীবন ভ্রমণে
তব অনুরাগী।

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এ।

---

## নূতন সংবাদ।

১। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত দুইটী ছাত্রী বৃত্তি পাইয়াছে:—

বিভাবতী মিত্র বেথুন কলেজ ২৫৲ ও শান্তা চট্টোপাধ্যায় বেথুন কলেজ ২০৲ টাকা।

২। হাইকোর্টে জুবিলি উপলক্ষে

আগষ্ট মাসের শেষে কলিকাতাবাসীদিগের পক্ষ হইতে টাউন হলে জজদিগকে ভোজ দেওয়া হইবে।

৩। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতে রেসমী দ্রব্যের একটী প্রদর্শনী হইয়াছিল। মহারাণী মেরী তাহার মধ্যে ভারতোৎপন্ন রেশমী দ্রব্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া কতকগুলি দ্রব্য ক্রয় করিয়াছেন। মৃতপ্রায় ভারতে শিল্প এখনও যাহা আছে তাহা দর্শন করিয়া বিদেশী শিল্পপ্রধান দেশের লোক সকল বিমুগ্ধ হন। কেবল ভারতবাসীরাই তাহাদের নিজের ঘরের অমূল্য রত্নের আদর করিতে এখনও জানিল না।

৪। বর্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক মিঃ ই, ই, ফোর্নিয়ার ডি, এল, বি, আপ্টোফোন নামক এক নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, এই যন্ত্র গন্ধক হইতে উৎপন্ন সিলিনিয়াম নামক পদার্থের সাহায্যে প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার সাহায্যে অন্ধ আলো দেখিতে পায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে জিনিষের এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় এবং তাহা দ্বারা এক জিনিষ হইতে অন্য জিনিষের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। সূর্য্য ও চন্দ্রের আলোর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কোন জিনিষের ছায়াপাত হইলে তাহারও শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। অন্ধগণ ইহার সাহায্যে জিনিষ চিনিতে পারিবেন। অধ্যাপক মহাশয় তিন বৎসর পরিশ্রমের পর এই যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। বিজ্ঞান দ্বারা দিন দিন যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সাধিত হইতেছে তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।

৫। ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর পত্রের সম্পাদক মিঃ মালাবারী গত ১১ই জুলাই বাতরোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি একজন সমাজসংস্কারক ও কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক ছিলেন।

৬। অসিলোগ্রাফ নামক আর একটী যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার ফটোগ্রাফ লইতে পারা যায়। ইহার সাহায্যে নাড়ীর গতি, শ্বাস প্রশ্বাসের অবস্থা, হৃদ্‌যন্ত্রের বৈদ্যুতিক অবস্থা ও স্পন্দনের শব্দ প্রভৃতি সমুদয় অবস্থা ফটোগ্রাফের দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

৭। ফেণী মহকুমার অধীন একগ্রামে বাসিরুদ্দিন নামক এক রুগ্ন বৃদ্ধ তাহার শেষ পক্ষের প্রৌঢ়া স্ত্রীকে একদিন ডাকিয়া অতি কাতর স্বরে বলে যে, আমার মৃত্যুর পরে তুমি আমার অসহায় শিশু কয়টীকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিও না, আমার মৃত্যু সময়ের এই কথাটী পালন করিও। পত্নী এ কথায় কোন উত্তর করিল না। সে কেবল বৃদ্ধের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে অবসন্নদেহে তাহার পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল। সকলে দেখিল সাধ্বী সতীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে।

৮। নাভার মহারাজা তাঁহার পর-

লোকগত পিতা মহারাজ হীরা সিংএর স্মৃতিরক্ষার্থ প্রজাবর্গকে শিক্ষা দিবার জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ হইতে প্রজাগণ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিদেশে শিক্ষার জন্য গমনের ব্যয় প্রাপ্ত হইবে।

---

# বামারচনা।

## প্রার্থনা।

জগদীশ! তব পাশে,
কি আর যাচিব আমি।
সবি তো দিয়েছ মোরে,
হে মোর হৃদয়স্বামী॥
আজিকে যাচি গো শুধু
তোমার চরণতলে।
ওপদ পূজিয়ে যেন
যেতে পারি তব কোলে॥
কে আছে, নয়নে যার
ঝরে নাই অশ্রুজল?
দহে নাই কার হৃদি
দুর্ব্বিষহ শোকানল?
সে সকল দুঃখে যেন
নাহি হই বিচলিত।
তোমার অসীম প্রেমে
পাবে বল মোর চিত॥
দাও প্রাণে নব বল,
হৃদে তব প্রেমালোক।
মোহান্ধতা কেটে যাবে,
ভুলে যাব দুঃখ শোক॥
হৃদয়ে ভকতি দিয়ে
রাখ তব পদছায়।
তোমারই কার্য্যে যেন
(এ) জীবন কাটিয়া যায়॥
পরসুখে সুখী হ'য়ে
পরদুখে দুখী হই।
পরের আনন্দে যেন
আনন্দিত হ'য়ে রই॥
পরতরে যেন সদা
জীবন যাপিতে পারি।
কভু যেন নাহি আসে
দুর্দ্দান্ত ভীষণ অরি॥
তব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি
জাগুক্ এ হৃদিমাঝ।
নিষ্কাম নিঃস্বার্থ প্রাণে
সাধি যেন তব কাজ॥
যে কার্য্য সাধিতে প্রভো!
পাঠায়েছ এ সংসারে।
সে কার্য্য সাধিয়ে যেন
যেতে পারি পরপারে॥
মাতিয়া অসার সুখে,
ছিনু প্রভো তোমা ভুলে।
তাই কি পতিরে মোর
নিজ কোলে নিলে তুলে!
তাহাতে ব্যথিত কেন
আজিকে হইব প্রভো!
তুমি দিয়াছিলে পতি,
তুমি তো লইলে বিভো!

ধরিয়া রাখিতে মোরা
কাহাকেও পারিব না।
সময় হইলে লবে,
ক্রন্দন তো শুনিবে না!
এখন বুঝেছি প্রভো!
এ সবি স্বপনময়।
খেলা ধূলা সাঙ্গ হ'লে
তোমাতে হইব লয়॥
দুদিনের তরে সবে
খেলিতে তোমার খেলা।
মোহেতে ডুবিয়া থাকি,
দেখি না যে হ'ল বেলা॥
এ যে তব লীলা খেলা,
তাহা তো বুঝি না মোরা।
সংসারে ডুবিয়া থাকি,
হয়ে শ্রান্ত পথহারা॥
স্বরগের পথ প্রভো,
মোদের দেখায়ে দাও।
মোহনিদ্রা ভেঙ্গে দিয়ে
তব কোলে তুলে লও॥
আসিয়া বস হে
শূন্য এ হৃদয়াসনে।
স্বর্গসুখে রব আমি,
লভিয়া পরম ধনে॥

শ্রীমতী প্রিয়বালা চৌধুরাণী,
সিকদারবাগান।

---

## সতী বিদায়।

নব বৈশাখের নবম নিশীথে,
চন্দ্র তারা মিলি ভেটিল দোঁহাতে,
নীরবে হুতাশে পরিম্লান চিতে,
ধরণী আনন মলিনা হেরি।

স্তব্ধ দশ দিশি স্তব্ধ তরু লতা,
তন্দ্রাহীন আঁখি নাহি কহে কথা,
বিটপে বিহগী চমকিছে তথা,
কি যেন তরাসে মরিছে ডরি।

বিরহ সমীর তীব্র জ্বালা সনে,
বিদায়বারতা দিয়ে গেল প্রাণে,
সতর্ক করিল প্রতি মনে কাণে,
বাঁধ হিয়া দৃঢ় পুরুষ নারী।

এত দিন ধরে আদরে যতনে
যে প্রেম রোপিয়া হৃদয় অঙ্গনে
ফল ফুল শোভা দিল প্রাণ-মনে
আজি অবসান হলো যে তারি।

নীরবে আকুলে ভাবিতে ভাবিতে,
তাড়িত লহরী সমান চকিতে,
জ্বালাময়ী কাল আসি আচম্বিতে,
তখনি শিয়রে দাঁড়াল ঘেরি!

কোমল শয্যায় আছিলা শয়ানা,
বজ্র ব্যথা বক্ষে ধীরা বরাননা,
বিষম বিকারে চৈতন্যবিহীনা,
শুষ্ক লতা সম লুটায় মরি!

সীমন্তে সিন্দুর অলক্ত চরণে,
শান্ত স্থির আঁখি প্রশান্ত বদনে,
সাধ্বী পতিব্রতা নিমগ্ন ধেয়ানে,
হরিপ্রেমে মজি সে পদ স্মরি।

আরোহি সুভগে পুষ্পক বিমানে,
পতি-পদরেণু সর্ব্বাঙ্গ লেপনে,
যেন সৌরভিত পবিত্র চন্দনে,
সুসজ্জিতা সতী সধবা-বেশে।

স্বরগে মরতে দুন্দুভি বাজিল,
দেব নরে মিলি ধন্তবাদ দিল,
পুণ্য তীর্থে পশি পুণ্য প্রকাশিল
পবিত্র জাহ্নবী ডাকিল হেসে ?

সঞ্চিত প্রণয় ফুরাইল আজি,
গৃহরাজ্যে ছিল দেবীরূপে সাজি,
ভক্ত সম ছিনু তার প্রেমে মজি
যে দিন প্রথম হেরি নয়নে।

বসিয়ে বিরলে মন্দাকিনীতীরে,
ফেলি অশ্রুরাশি সে নির্ম্মল নীরে,
অতীতের সুখস্মৃতি মর্ম্মরে,
তরঙ্গে তরঙ্গে ঘোর গর্জ্জনে।

বহু বর্ষ ব্যাপি সুখদুখছায়া,
ভালবাসা, স্নেহ, সখ্য, দয়া, মায়া,
নিজ নিজ রূপে সদা প্রকাশিয়া,
হর্ষ বিষাদে রেখে ছিল ঢাকি।

কেটে গেল আজি সেই কুহেলিকা,
কোথা সে সঙ্গিনী কোথা সৌহৃদ্যতা,
কত ব্যবধান কে দেয় বারতা,
ঘুচিল সম্বন্ধ সকলি ফাঁকি।

অসার ক্রন্দন শোকের আগুনে,
পোড়ায় মানবে জীবন্ত জীবনে,
ছিন্ন ভিন্ন করে বিষাদ তুফানে,
বিষম পরীক্ষা বিধির লিপি।

ধৈরজ অঞ্চলে আবরিয়া তনু,
যদি চাহে প্রাণ মুছি শোক রেণু,
প্রেম মূরতি ঝলে অণু অণু
ভুলায়ে দেয় গো চৈতন্তরূপী॥

শ্রীমনোজবা রচয়িত্রী।

---

## “মিহিরের শিশু”।

চারিদিকে শোক তাপ সকরুণ হাহাকার।
কেরে তুই ক্ষুদে ছেলে, কৃপা কণা দেবতার,
তুই কিরে পারিজাত অমরবাঞ্ছিত ফুল ?
তুই কি দেবের শিশু এসেছিস্ করে ভুল ?
অতি অভাগিনী আমি, শোকদগ্ধ হিয়া,
কি করে রে জুড়াইলি, বল্ কোন্ সুধা দিয়া ?
ব্রহ্ম কমণ্ডলে তুই ছিলি কি “স্বরগ সুধা”?
সিঞ্চিলেন বিধি বুঝি হেরি
হেথা মৃত্যুবাধা।
তোর ওই মুখ চেয়ে,
স্নেহ উঠে বক্ষ ছেয়ে,
উথলি উঠেরে চিত্তে সপ্ত পারাবার,
ভেসে আসে আঁখি-আগে জ্যোতিরাশি তাঁর।

অন্-অন্ত প্রেমের হরি কণা তুই যাঁর,
যত দেখি যায় সাধ আরো দেখিবার,
আয় রে সোণার ছেলে কোলে একবার,
তুই এক মহৌষধি বুক জুড়াবার।
ধর আশীর্ব্বাদ এই “দীনা পিসীমার,”
কি আছে রে অনুপম ! তব উপমার ?
তোমারে দিবার মত,

কিছু মোর নাহি রে ত,
শুধু যাচি তব তরে কৃপা দেবতার!
মা, বাপের গ্লানি হর,
বংশে হও "চিরস্মর,"
চিরজীবী, স্নেহ, প্রীতি, করুণা আধার,
পুরাইও সব সাধ "দাদা, ঠাকুমার!"
যে গৃহে এসেছ তুমি
তুলনায় স্বর্গভূমি
উচ্ছ্বসিত মন্দাকিনী প্রীতি মমতার,
প্রবাহিছে হেথা সদা অতল অপার!
স্বীয় পুণ্য প্রভাগুণে,
উজলিয়ে এ ভবনে,
ঢালিও রে শান্তিধারা হৃদয়ে সবার,
তব হতে তৃপ্ত হোক্ নিখিল সংসার।
ওরে মিহিরের শিশু, প্রাণাধিক ধন,
কি তোরে বলিব আর।
"বালস্বর্গারুণী" তুমি প্রভাতকুমার,
হরিপদ শিরে ধরি জীবনের পথে চল
অনিবার।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার পিসীমাতা
সুশীলা।

---

## দর্প হরণ। *

হায় তখনো হাসিছে তারা!
উছলি পড়িছে কোমল কিরণ
লইয়া মাধুরীধারা!
জ্ঞানের বুদ্ধির জয়ধ্বজা তুলি,
মহা পারাবারে বহে হেলি দুলি,
ইন্দ্রপুরী সম "টিটানিক" পোত
গরবে হৃদয়হারা!
হায় তখনো হাসিছে তারা!
কারো নাহিক ভাবনা ভয়!
জননীর বুকে যেমতি তনয়
তেমতি পুলকে রয়।
জ্ঞানী গুণী জন ঘোষিল গৌরবে,
শোলা ডুবে যাবে তাও গো সম্ভবে,
তবু "টিটানিক" নিমগন হবে
এ কভু সম্ভব নয়,
কারো নাহিক ভাবনা ভয়!

অহো! সহসা একি গো হায়!
হিমগিরিঘাতে চূর্ণ "টিটানিক"
ধরা অচেতনপ্রায়।
না হইতে সুখনিশি অবসান,
কত শত দীপ অকালে নির্ব্বাণ।
কেহ পতিহারা কেহ পুত্রহারা
ওগো! শোকানল নভঃ-ছায়।
ভবে মানবশকতি কত!
দর্পে, গর্ব্বে, জ্ঞানে ঘোর অজ্ঞানতা
যেন ছেলেখেলা মত।
রহে একজন ধারণা অতীত,
তাঁর ঠাঁই সব গর্ব্ব পরাজিত,
তাঁর অতুলন শকতির কাছে
বিশাল জগত নত!
ভবে মানবশকতি কত!

শ্রীহেমন্তবালা দত্ত।

* "ট্যাইটানিক" জাহাজ মগ্ন হওয়া উপলক্ষে রচিত।

### মন্দির-পথে।

গগনের ভালে, দিক চক্রবালে,
ভেদ করি শুভ্র মেঘরাজি।
প্রসারি কিরণ, নবীন তপন,
উঠিতেছে নব রঙ্গে সাজি॥
পূজার সম্ভার, ভকতি অপার,
পূজিতে আজি বিশ্বজননী।
অতি সমাদরে, ঐ বিশ্বমন্দিরে,
গদ্‌গদচিতে চলিছে রমণী॥
সুদূরে আকাশে, কি আনন্দ ভাসে,
আরতি-প্রদীপ উঠেছে জ্বলি।
আলোকে ঝলক, জাগিছে পুলক,
নিখিল জগতে শোভে সকলি॥
বায়ুভরে বীণা, বাজে রীণা ঝিনা,
কুসুমচয় উঠিতেছে ফুটি।
রমণী যতনে প্রফুল্ল পরাণে,
পূজিতেছে তাঁর চরণ দুটি॥
কর আশীর্ব্বাদ, যাক অবসাদ,
হে অভয়া অই কর তুলি।
লহ লহ দান, পূর্ণ মন প্রাণ
দেহ স্থান মোরে ভক্ত বলি॥

কুমারী সুনীতি ভাদুড়ী,
কেশব-ধাম,
বেনারস।

## ভ্রমসংশোধন।

বৈশাখ মাসের প্রায়শ্চিত্ত উপন্যাস শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর লিখিত। ভ্রমবশতঃ নিরুপমা দেবীর স্থানে অনুরূপা দেবী ছাপ হইয়াছিল।

বামাবোধিনী কার্য্যালয়ের নম্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া ৩৯ নং হইয়াছে। গ্রাহক গ্রাহিকা ও লেখক লেখিকাগণ এখন হইতে ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পত্রাদি ও মূল্যাদি প্রেরণ করিবেন।

১৩।৩ মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।